এ যুগের বিজ্ঞান

আবদুল্লাহ আল-মুতী

এ যুগের বিজ্ঞান

আবদুল্লাহ আল-মুতী

মুক্তধারা

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১৩৪৫

প্রকাশক
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮১
দ্বিতীয় সংস্করণ মে ১৯৮৮

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : হাশেম খান

মুদ্রাকর
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

দাম : সাদা ৬০.০০ টাকা
লেখক কাগজ ৪৫.০০ টাকা

E JUGER VIJNAN (Science of Today) by Abdullah Al-Muti. Second Edition : May 1988. Cover and Design by Hashem Khan. Publisher : C. R. Saha MUKTADHARA [Prop. Puthighar Ltd.] 74 Farashganj Dhaka 1100 Bangladesh.

Price : Whiteprint Taka 60.00
Lekhakprint Taka 45.00

উৎসর্গ

মিনা-কে

এ যুগের বিজ্ঞান
আবদুল্লাহ আল-মুতী

অবশেষে **এ যুগের বিজ্ঞান** প্রকাশিত হল। ১৯৬৯ সালে লেখকের **বিজ্ঞান** ও মানুষ নামে একটি রচনা-সংকলন প্রকাশের জন্যে তৈরি হয়; সেটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে ১৯৭৫ সালে। বইটির 'লেখকের নিবেদন'-এ এ-বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

এ-বইতে অন্তর্ভুক্ত সব রচনাই ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। নানা কারণে গ্রন্থাকারে প্রকাশে বিলম্ব ঘটায় কিছু কিছু রচনা যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কার করা হয়েছে; সংকলনের রচনায় যোগবিয়োগও ঘটেছে। রচনাগুলো অধিকাংশ ষাটের ও সত্তরের দশকে লেখা। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন 'রেডার' ও 'নক্ষত্র-রহস্য' সম্পর্কিত লেখা দুটির প্রথম প্রকাশ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকীতে—যথাক্রমে ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫২-৫৩ সালে। 'নিঃশব্দ শব্দঢেউ-এর জাদু' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে আবু জাফর শামসুদ্দীন ও মোহাম্মদ নাসির আলী সম্পাদিত "নয়া সড়ক' নামে সংকলনে। এসব রচনা অনেকাংশে পুনর্লিখিত হয়েছে।

এ যুগে বিজ্ঞান শুধু বিপুলভাবে ব্যাপ্ত আর বহুবিচিত্র নয়, নিয়ত চলমান ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সংযোগ

রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের পক্ষেও রীতিমতো দুঃসাধ্য। অথচ বিজ্ঞানের অগ্রগতির মোটামুটি পরিচয় না জেনে একালে কারো পক্ষেই নিজেকে শিক্ষিত বা সংস্কৃতিবান মানুষ বলে দাবি করা সম্ভব নয়। এ বইতে বর্তমান কালের বিজ্ঞানের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য দিকের সঙ্গে এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের পরিচিত করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ থেকে যদি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ধারা সম্পর্কে সুধী পাঠকদের ধারণা কিছু পরিমাণে স্পষ্টতর হয় তাহলে লেখকের চেষ্টা সার্থক হবে।

অসংখ্য বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী বইটি প্রকাশের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে ও আরো নানাভাবে সহায়তা করেছেন। সেজন্য তাঁদের সবার কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। অবশ্য এর ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব প্রধানত লেখকেরই। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যে কোন সমালোচনা, মতামত ও উপদেশ সাদরে গৃহীত হবে।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

লেখকের অন্যান্য বই

এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে (চতুর্থ সং)
অবাক পৃথিবী (তৃতীয় সং)
আবিষ্কারের নেশায় (তৃতীয় সং)
রহস্যের শেষ নেই (তৃতীয় সং)
বিজ্ঞান ও মানুষ (দ্বিতীয় সং)
স্বাধীনতা, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
সাগরের রহস্যপুরী
জানা-অজানার দেশে (দ্বিতীয় সং)
তারার দেশের হাতছানি (দ্বিতীয় সং)
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
মেঘ বৃষ্টি রোদ
সোনার এই দেশ
ফুলের জন্যে ভালবাসা
বিপন্ন পরিবেশ
বিচিত্র বিজ্ঞান
প্রাণলোক ঃ নতুন দিগন্ত
বিজ্ঞানের বিস্ময়
বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
টেলিভিশনের কথা
কীটপতঙ্গের বিচিত্র জগৎ
কাজী মোতাহার হোসেন

সূচীপত্র

নিত্যদিনের সাথী

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিত্যদিন বিজ্ঞান আমাদের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আরো দীর্ঘকাল বাঁচা, আরো ভাল করে বাঁচা মানুষের চিরকালের স্বপ্ন। তেমনি মানুষের চিরদিনের সাধনা তার চারপাশের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা; পরিবেশকে মানুষের উন্নত জীবনের আরো অনুকূল করে তোলা।

আর কতদিন বাঁচব

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

আর কতদিন বাঁচব?—প্রশ্নটা পুরনো। আর তার জবাবও মানুষ খুঁজছে সেই কোন্ কাল থেকে! কখনো হস্তরেখাবিদ জ্যোতিষীর কাছে, কখনো স্বপ্নাদ্য মাদুলি বা মন্ত্রে, কখনো পীর-দরবেশের মাজারে শিরনি দিয়ে।

জীবন আর মৃত্যু চিরসঙ্গী আমাদের। তবু মানুষ যেমন যুগে যুগে জীবন আর যৌবনের জয়গাথা গেয়েছে, তেমনি অতিক্রম করতে চেয়েছে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনকে। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে" জেনেও মানুষ তার উদগ্র জীবন-তৃষ্ণা ব্যক্ত করে বলেছে, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"।

জরা, ব্যাধি আর মৃত্যুকে মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি বলেই বুদ্ধদেব জরাজয়ী তত্ত্ব-সন্ধানে সংসারত্যাগী হয়েছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ গ্যেটে তাঁর ফাউস্ট মহাকাব্যে রূপায়িত করেছেন মানুষের অনন্ত যৌবনের স্বপ্ন। জীবনকে নশ্বর জেনেও সব মানুষই বুঝি মনে-প্রাণে কামনা করে অমরত্ব। এই অমরত্বের সন্ধানেই প্রাচীন মিশরের রাজ-রাজড়ারা তাঁদের মৃতদেহকে মমি করে রাখার ব্যবস্থা করেন। নশ্বরতার ঊর্ধ্বে ওঠা আর তারুণ্যকে চিরস্থায়ী করার কামনাকে মানুষ যুগে যুগে রূপ দিয়েছে উপ-কথায়, কিংবদন্তীতে, কাব্যে; এই আকাঙ্ক্ষার প্রভাব পড়েছে ধর্মগ্রন্থেও।

স্বাভাবিক নিয়মে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে মানুষ? আমাদের দেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ু মাত্র ৫০ বছর। কিন্তু পাশ্চাত্যের অধিকাংশ উন্নত দেশেই এই অঙ্ক সত্তরের ওপরে। অবশ্য গড়পড়তা আয়ু সত্তর বা প'চাত্তর যে দেশে, সেখানে আশি বা নব্বই বছর বাঁচে এমন লোকের সংখ্যা যথেষ্ট। তবে একশ' বছরের ওপর বাঁচার দৃষ্টান্ত আজও রীতিমত বিরল। শুধু এক সোভিয়েত দেশে দেখা যায় প্রায় ২৪,০০০ শতায়ু ব্যক্তি—অর্থাৎ প্রতি কোটিতে আট-শ'র কাছাকাছি (এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের ওপর মহিলা)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এই হার কোটিতে প্রায়

১৫০ (কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এর চেয়ে অনেক কম), ফ্রান্সে ৭০, ব্রিটেনে ৬০, জাপানে ১০। সোভিয়েত ইউনিয়নে শতায়ুদের মধ্যে অধিকাংশের বাস জর্জিয়া আর আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রে—অর্থাৎ ককেশাস পর্বতাঞ্চলে। এদের মধ্যে ১৫০ বা ১৬০ বছর বয়সী লোকেরও সাক্ষাত মেলে।

প্রাচীনকালের তুলনায় আজ মানুষের আয়ু বাড়ছে না কমছে? প্রাচীন-কালে মানুষ অনেক বেশিদিন বাঁচত এমন কিংবদন্তী শোনা যায়। কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ মেলা শক্ত। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার জনক হিপোক্র্যাটিস বেঁচেছিলেন প্রায় ৯০ বছর, পিথাগোরাস ৮২ বছর, প্লেটো ৮০ বছর। কিন্তু তবু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এগুলো ছিল স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম। প্রাচীন গ্রীস আর রোমের সাধারণ মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র বিশ বছরের মত, মধ্যযুগের ইউরোপে ছিল মোটামুটি ত্রিশ বছর—ঠিক যেমন ছিল আমাদের দেশে এই শতকের শুরুতে।

তাহলে বাইবেলে যে মেথুসেলা ৯৬৯ বছর বেঁচেছিলেন বলে উল্লেখ আছে তার কি হবে? কেউ কেউ বলছেন, হয়ত সে সময়ে চাঁদের এক একটি মাসকেই ধরা হত এক বছর (যেমন এখনও হয় রেড ইনডিয়ানদের মধ্যে)। তাহলে আজকের হিসেবে তাঁর আয়ু দাঁড়াবে ওই সংখ্যাকে বার দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তার কাছাকাছি, অর্থাৎ মোটামুটি ৮১ বছর। এভাবে ধরলে বাবা আদমের ৯৩০ বছর হয়ে দাঁড়ায় মোটামুটি ৭৮ বছর; তাঁর নাতি ইউনুসের ৯০৫ বছর হয় ৭৫ বছর। মিশরের মমি তৈরির সময়কার বা তার আগের মানুষের তুলনায় আজকের মানুষের দেহে এমন কোন বিরাট জৈবিক পার্থক্য ঘটেনি যে, সেকালের চেয়ে আজ মানুষের জীবনকাল কমে যাবে। বরং বাইবেলে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু তিন কুড়ি দশ বা সত্তর বছরের কথাই বলা হয়েছে। আজ থেকে তিন-চার হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিরাও বর দিতেন শতায়ু হবার; অর্থাৎ সেকালে একশ' বছরের বেশি বাঁচার আশা তেমন কেউ করতেন না।

প্রাণী ভেদে আয়ুভেদ হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। ফলের পোকা ড্রসোফিলা মাছি বুড়ো হয়ে যায় মাত্র চল্লিশ দিনে, ইঁদুর বাঁচে বড়জোর দু-তিন বছর। অবার গালাপাগোস দ্বীপের কচ্ছপকে বাঁচতে দেখা গেছে ১৮০ বছর পর্যন্ত। প্রাণীর সাবালকত্ব লাভ আর তার জীবনকালের মধ্যে মনে হয় একটা মিল আছে। বেড়াল সাবালক হয় দেড় বছরে, বাঁচে

প্রায় দশ বছর। ঘোড়া সাবালক হয় ৪ বছরে, বাঁচে ২৫-৩০ বছর। অর্থাৎ সাবালক হওয়ার কালের চাইতে আয়ুষ্কাল ছ'-সাত গুণ লম্বা। মানুষ সাবালক হয় ২০-২২ বছরে ; সে হিসেবে তার নীরোগ সবল দেহে ১২৫ বা ১৫০ বছর না বাঁচতে পারার তেমন জীবতাত্ত্বিক কারণ আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে এর অনেক আগেই। মাত্র কয়েক শ' বছর আগেও বেশির ভাগ লোকের মৃত্যু ঘটত শৈশবে নানা সংক্রামক রোগে আর মহামারীতে। প্রাচীন ইউরোপে বার বার গ্রাম-জনপদ দেশের পর দেশ উজাড় হয়েছে মড়কে-মহামারীতে। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতেও নিউইয়র্ক শহরে বার বার হানা দিয়েছে কলেরা, পীতজ্বর, টাইফাস—হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছে এসব রোগের কবলে পড়ে।

কেউ কেউ হিসেব করে বলছেন, গত একশ' বছরে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, টাইফাস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু ঘটিত ব্যাধি প্রতিরোধে যে অগ্রগতি হয়েছে, তার আগের হাজার বছরেও তা হয়নি। আবিষ্কৃত হয়েছে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি, রোগের বিরুদ্ধে টিকা, অ্যান্টিবায়টিক ওষুধ। তার ফলে কমেছে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার, ব্যাধিজনিত মানুষের অকালমৃত্যু। আমাদের দেশে এখনও এক বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ১৪; অথচ উন্নত দেশগুলোতে এই হার মোটামুটি এক বা দেড় শতাংশের বেশি নয়। আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কল্যাণেই এসব দেশে শিশু-মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা ও সম্ভাব্য আয়ুর তুলনা

	মোট জনসংখ্যা (কোটিতে—১৯৮৭)	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	বার্ষিক বৃদ্ধি (শত করা)	শিশুমৃত্যু (বার্ষিক হাজারে)	জন্মের সময় সম্ভাব্য আয়ু
পৃথিবী	৫০৩	২৭	১০	১.৭	৮১	৬৩
বাংলাদেশ	১০.৭	৪৪	১৭	২.৭	১৪০	৫০
ভারত	৮০.০	৩৩	১২	২.১	১০১	৫৫
চীন	১০৬.২	২১	৮	১.৩	৬১	৬৬
ব্রিটেন	৫.৭	১৩	১২	০.২	৯	৭৪
জাপান	১২.২	১২	৬	০.৬	৬	৭৭
সুইডেন	০.৮	১২	১১	০.১	৭	৭৭

তথ্যসূত্র : পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো, ওয়াশিংটন, ডি. সি. ১৯৮৭।

সারা দুনিয়ার মানুষের গড়পড়তা আয়ু আজ ৬৩ বছর। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে এই হার ৭০ থেকে ৮০ (পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি)। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে গত দেড়শ' বছরে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯০০ সালের তুলনায় আজ সারা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যায় ৬৫ বছরের বেশি বয়সীর হার বেড়েছে অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ; কোন কোন দেশে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণে।

দুনিয়াজুড়ে জীবাণুঘটিত ব্যাধি আর মহামারীতে মৃত্যু কমেছে। কিন্তু সাথে সাথে বেড়েছে জরা, হৃদরোগ, রক্তচাপ, ক্যান্সার, ফ্লু ও মানসিক ব্যাধি। এটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। বরং বলা চলে জীবাণুর বিরুদ্ধে মানুষের বিজয় লাভেরই এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আগে অধিকাংশ লোক জীবাণুর আক্রমণে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত বলে স্বাভাবিক জরার আক্রমণ এমন স্পষ্ট হয়ে উঠত না। অকালমৃত্যু প্রতিরোধের ফলে আজ জরাঘটিত এবং পরিবেশ দূষণজনিত ব্যাধিগুলোই হয়ে উঠছে প্রধান। অধিকাংশ উন্নত দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ দেখা যায় তিনটি—হৃদরোগ, ক্যান্সার আর সন্ন্যাস।

মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে আজ জন্ম হয়েছে চিকিৎসাবিদ্যার নতুন নতুন বিভাগের: জরার সমস্যা সন্ধানের জন্যে উদ্ভব ঘটেছে জরা-বিজ্ঞান, বার্ধক্য চিকিৎসাবিদ্যা হয়ে উঠেছে এক বিশাল বর্ধিষ্ণু ক্ষেত্র। এসব নতুন বিজ্ঞানে ইতিমধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বই লেখা হয়েছে। মানুষের দেহে কেন বার্ধক্য দেখা দেয় আর কি করে তাকে প্রতিরোধ করা যায়, এ বিষয়ে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে দু-শ'-আড়াই শ' তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন।

এটা মোটামুটি সবারই জানা যে, মানবদেহের পেশীগুলো সর্বোচ্চ কর্ম-ক্ষমতা অর্জন করে বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। তার পর থেকে ক্রমে ক্রমে তাদের কর্মক্ষমতায় ভাটা পড়ে। একজন মার্কিন বিজ্ঞানী হিসেব করে বলেছেন, ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি বছর দেহের কর্মক্ষমতা কমতে থাকে শতকরা ০.৮ ভাগ হারে। অবশ্য দেহের সব ধরনের কোষের ক্ষমতা যে একই হারে কমে তা নয়। ত্রিশ বছর বয়সের কর্মক্ষমতাকে পূর্ণমাত্রা (১০০) ধরলে মানুষের ফুসফুস ও বৃক্কের কর্মক্ষমতা যাট

বছর বয়সে কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬০ ভাগ ও ৬৫ ভাগ। হৃৎপিন্ড আর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে সে অনুসারে আরো কম—ষাট বছর বয়সে দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮০ আর ৮৫।

বার্ধক্যের প্রধান প্রধান লক্ষণ অনেকগুলোই রীতিমত দৃষ্টিগ্রাহ্য। কাল চুল শুভ্রতায় ছেয়ে যায় ; তাছাড়া চুল হালকা হয় ; দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। পেশী দুর্বল, সঙ্কুচিত হয়, চামড়া হয়ে আসে শিথিল, অস্থিসন্ধির সচলতা কমে আসে, দেহের চালচলনে তারুণ্যের সপ্রতিভতা থাকে না। ক্রমে ক্রমে হাড় হয়ে পড়ে ভঙ্গুর। রক্তবহ শিরায় কাঠিন্য দেখা দেবার ফলে সেগুলোর স্থিতিস্থাপকতা কমে। ফুসফুস কম অক্সিজেন গ্রহণ করে, কম রক্ত শোধন করে ; হৃৎপিন্ড কম রক্ত সঞ্চালন করে। অর্থাৎ দেহের কোষে কোষে পুষ্টি আর অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়। বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও তাদের হরমোন নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। সবকিছু মিলিয়ে দেহের সামগ্রিক কোষের বিপাকক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত দেহযন্ত্রের কাজ মন্থর হয়ে আসে।

মানুষের দেহে নানা ধরনের পেশীর সংখ্যা মোটামুটি ছ শ'। এসব পেশীর মোট ওজন সমস্ত দেহের ওজনের ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম। বার্ধক্যে পেশীসমূহ দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ার ফলে কায়িক শ্রমের ক্ষমতা স্বভাবতই ক্রমে ক্রমে কমে আসে। কিন্তু অন্যান্য দেহতন্ত্রের তুলনায় স্নায়ুতন্ত্রের জরা আসে অনেকটা ধীর গতিতে, তাই মানুষের মননশক্তি দীর্ঘকাল মোটামুটি অটুট থাকে। আর এজন্যেই মাই-কেল অ্যাঞ্জেলো, লেভ তলস্তয়, বার্ণার্ড শ বা রবীন্দ্রনাথ অশীতিপর বয়সেও তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত রাখতে পারেন।

তবে মস্তিষ্ককোষের জরা ধীরগতি মাত্র, কালের অমোঘ প্রভাবের বাইরে নয়। সমগ্র দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক—অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের মূল কেন্দ্র নিউরন কোষগুলি। মস্তিষ্কের নিউরন কোষের সংখ্যা মোটামুটি দেড় হাজার কোটি। ত্রিশ বছর বয়সের পর তার মধ্যে প্রতিদিন অব্যাহত ধারায় মৃত্যু ঘটতে থাকে প্রায় এক লক্ষ কোষের। এত বেশি সংখ্যায় কোষের ক্ষয় রীতিমত ভীতিজনক মনে হতে পারে, বিশেষ করে একথা মনে পড়লে যে দেহের অন্যান্য অঙ্গের কোষের মত মস্তিষ্কের কোষের পুনর্জন্ম ঘটে না। কিন্তু সামান্য একটু হিসেব করলে বোঝা যাবে এই হারে মস্তিষ্কের নিউরন ভান্ডারের দশ শতাংশ নিঃশেষ হতে চল্লিশ বছরের ওপর সময়ের দরকার।

বার্ধক্যের এক পর্যায়ে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। তখন পরিমিত অক্সিজেন ও পুষ্টির ঘাটতি পড়ায় মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে ; কারো কারো ক্ষেত্রে বার্ধক্যের অতিস্পর্শকাতরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, নিঃসঙ্গ বিষণ্নতা, স্থবিরতা, বাস্তববিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

অবশ্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বার্ধক্যই যে শুধু বিভিন্ন তালে চলে তাই নয়, দেহের বার্ধক্য আর মনের বার্ধক্যও সব সময় এক তালে চলে না। বিভিন্ন ব্যক্তিতেও এসব পরিবর্তন দেখা দেয় বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বুড়িয়ে যায়, আবার কোন কোন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও সদাহাস্য, সজীব আর কর্মময় দেখতে পাওয়া যায়।

•

আবার সেই পুরনো প্রশ্নে ফিরে আসা যাক : কেন আসে এই জরা, আর কি করে তাকে ঠেকানো যায় ? কিংবা আদৌ জরাকে প্রতিরোধ করা কি সম্ভব ?

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীরা এসব প্রশ্নের জবাবে এখনো একমত নন। নানা পরীক্ষা, নানা মত, নানা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এই গূঢ় চিরন্তন প্রশ্নের জবাব অন্বেষণ চলছে। আর এই জিজ্ঞাসা আর সন্ধানের মধ্য দিয়েই মানুষ আবিষ্কার করে চলেছে জীবনের প্রক্রিয়া আর পরিণতি সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য।

আমরা জানি মানুষ এবং সব জীবদেহের জন্ম একটি নিষিক্ত কোষ থেকে আর তার বৃদ্ধি ঘটে নিরন্তর কোষ বিভাজনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন কোষকলার পরিণতি মোটামুটি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে থাকে কোষকেন্দ্রের ক্রোমজোম আর তার অঙ্গীভূত অতি সূক্ষ্ম জীন বা বংশাণু কণিকায়। ধান গাছের কোষে জীন-কণিকার রাসায়নিক ভাষায় যে কর্মতালিকা লেখা, তাতেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে কখন কি হারে চলবে তার কোষ বিভাজন আর কখন বন্ধ করতে হবে এই প্রক্রিয়া। এমনি কর্মসূচীর নির্দেশ রয়েছে মানবদেহের কোষকেন্দ্রেও।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি মানবশিশুর ভ্রূণের কোষ কৃত্রিম খাদ্যরসে রেখে তার বৃদ্ধি পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেল অনুকূল পরিবেশে কোষ বিভাজনের ফলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে কোষের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তারপর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে একাদিক্রমে। তবে চিরকাল নয়, মোটামুটি পঞ্চাশবার দ্বিগুণ হবার পর কোষ বিভাজন বন্ধ হয়। বার বার এই পরীক্ষা করা হল, প্রতিবারই মোটামুটি পঞ্চাশ বার দ্বিগুণ হবার পর কোষ বিভাজন থেমে গেল।

এবার বিজ্ঞানীরা কয়েকবার কোষ বিভাজনের পর কোষগুলোকে তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রবল ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেললেন। তাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ স্তব্ধ হল। বেশ কিছুদিন পর তাদের আবার আনা হল স্বাভাবিক তাপ-মাত্রায় ; আর আশ্চর্যজনকভাবে সাথে সাথে সজীব হয়ে উঠে আবার তারা কোষ বিভাজন শুরু করল। তারপর যথানিয়মে কিছুদিন পর থেমে গেল এই প্রক্রিয়া। জমিয়ে ফেলার আগে আর পরে কতবার কোষ দ্বিগুণ হয়েছে সেটা হিসেব করে দেখা গেল সংখ্যাটা রয়েছে সেই আগের মতই, অর্থাৎ মোটামুটি ৫০ বার। এ যেন এক আশ্চর্য দম-দেয়া ঘড়ি। নির্দিষ্ট সময় চলার জন্যে তাকে দম দেয়া হয়েছে ; মাঝপথে থামিয়ে আবার চালিয়ে দিলেও তার সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দম না ফুরানো পর্যন্তই চলবে ঘড়ি। ভ্রূণকোষের বেলায় এমনকি ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেয়ার তের বছর পর কোষের পুনর্জীবন ঘটিয়েও দেখা গেল জীন-কণিকার স্মৃতি ঠিক মনে রাখতে পারে, জমাবার আগে কতবার তার কোষ বিভাজন হয়েছে আর কত-বার কোষ বিভাজনের কাজ বাকি আছে।

বিজ্ঞানীরা জীন-কণিকার এই আশ্চর্য দম-দেয়া ঘড়ি নিয়ে গত কয়েক বছরে নানা বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁরা জেনেছেন, ডি-এন-এ নামে এক জটিল রাসায়নিক অণুর গায়ে নানা মৌলের সমাবেশে বিচিত্র সংকেতের ভাষায় লেখা থাকে এই কর্মসূচী। কিন্তু ডি-এন-এ-র এই দম-দেয়া ঘড়ির মত পূর্ব-নির্দিষ্ট জীবনকালই যদি হবে সব জীবের নিয়তি, তাহলে তো দম শেষ হলে জীবনের আকস্মিক সমাপ্তিও ঘটতে পারত ; জরার লক্ষণগুলো দেখা দেবার প্রয়োজন কি?

এর ব্যাখ্যা দেবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বললেন, কোষ-বিভাজনের প্রক্রিয়া ত্রুটিহীনভাবে চলে না। নানা কারণে এই বিভাজনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে পিতৃপুরুষের বংশগতির ছাপ ; তেমনি রয়েছে পরিবেশেরও প্রভাব। চারপাশের পরিবেশে ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে নানা তাড়না, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তরঙ্গ, পরিবেশের তেজস্ক্রিয়া, নানা ধরনের রাসায়নিক দূষণ, কাঁপুনি, শব্দ, মাদকদ্রব্য, অতি উত্তেজনা—সবই চারপাশ থেকে আক্রমণ করছে আমাদের দেহকে, কিছু কিছু ত্রুটি ঘটাচ্ছে কোষ-বিভাজনের প্রক্রিয়ায়। এমনি ধরনের খানিকটা বৈকল্য অতিক্রম করার মত রক্ষাব্যবস্থা জীনের কর্মসূচীতে লেখা থাকে। কিন্তু চারপাশের আক্রমণ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে তখন এই রক্ষাব্যবস্থার ব্যূহ ক্রমে

ক্রমে ভেঙে পড়ে। আর কোষ-বিভাজনের ত্রুটিও তাই পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অবশেষে এমনি পুঞ্জীভূত বৈকল্য সমগ্র যন্ত্রটিকেই বিকল করে তোলে।

বিজ্ঞানীরা এও দেখেছেন যে, মানুষের দেহে সব ধরনের কোষকলার বিভাজন একই গতিতে হয় না। কতগুলো কোষকলার বিভাজন হয় দ্রুতগতিতে ; তার মধ্যে পড়ে রক্তকলা, চামড়া, পাকস্থলীর ঝিল্লীর কোষ। রক্তকোষের লোহিত কণিকার আয়ু নিতান্তই মাস চারেক। দেহে প্রতিদিন নবায়িত হচ্ছে প্রায় ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার কোটি রক্তকোষ ; এভাবে প্রতি চার মাসে দেহের সব রক্তকোষ পাল্টে যায়। পেশীকোষ ও অন্যান্য বিশেষ ধরনের কোষ নবায়িত হতে বেশি সময় লাগে ; কিন্তু তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে মস্তিষ্ক ছাড়া প্রায় সমগ্র দেহেরই কোষ নবায়িত হয়। দু'বছর বয়সের পর মস্তিষ্ক কোষ বা স্নায়ুকোষ আর নবায়িত হয় না।

জরাবিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ যে শুধু জরা আর বার্ধক্যের কারণ সন্ধান করছে তাই নয়, তার সাথে জানতে চাইছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, বিভিন্ন ধরনের কোষকলার বিকাশ ও পরিণতির নিয়মকানুন। সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে বয়োবৃদ্ধির ফলে দেহ-কোষের বিপাক ও স্বতোনিয়ন্ত্রণে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় সে সম্পর্কেও। এসব নিয়মকানুন জানলে হয়ত মানুষ তাকে নিজের সুবিধেমত প্রভাবিত করার পন্থাও উদ্ভাবন করতে পারবে।

আজকের সবচেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিগুলোর মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে হয়ত ক্যান্সার প্রতিরোধের পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হতে পারে।

বাইরের কোন বস্তু এসে দেহের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটালে তার হাত থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্যে দেহের নিজস্ব অনাক্রমব্যবস্থা বা প্রতিরোধ শক্তি কার্যকর হয়। যেমন দেহে কোন দুর্বল রোগজীবাণু প্রবেশ করলে এই অনাক্রমব্যবস্থা নিজস্ব প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেহের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এই পদ্ধতিরই একটি সাধারণ প্রয়োগ হচ্ছে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে টিকা দান ব্যবস্থা।

ক্যান্সারজাতীয় কোষের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষার জন্যেও অনাক্রমব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। প্রতিদিনই আমাদের দেহে হানা দিচ্ছে বাইরের অন্ততঃ ১০,০০০ ক্যান্সারজনক কোষ। এদের প্রতিরোধ করে নিষ্ক্রিয়

করে দিচ্ছে দেহের অনাক্রমব্যবস্থা। বয়োবৃদ্ধি বা আর কোন কারণে যখন এই প্রতিরোধ ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে, তখনই দেহে ঘটে ক্যান্সারের আক্রমণ। তাই সাধারণতঃ বেশি বয়সেই এই রোগের প্রকোপ দেখা যায় বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যে টিকা ব্যবহার করে ফল পাওয়া গিয়েছে।

তাহলে বার্ধক্য প্রতিরোধের পন্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অভিমত কি? তাঁরা বলছেন, সালসা, বটিকা, প্রসাধনী বা মাদুলি নয়, অকালবার্ধক্য রোধের শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্বাস্থ্যকর জীবন পদ্ধতি, ফলপ্রসূ নিয়মিত শ্রম, অর্থপূর্ণ আনন্দময় কর্মধারা, আর জীবন সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি।

পরিবেশের প্রভাবের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আধুনিক জীবনে জটিলতা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে দেহের ওপর বাইরের পরিবেশের নানা ধরনের চাপ। তাই জরার প্রভাবকে প্রতিহত করতে হলে বাইরের পরিবেশকে উন্নত করার কথাও ভাবতে হবে। সোভিয়েত আজারবাইজানের সত্তর লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতায়ুর সংখ্যা হাজারের ওপরে। তাদের এই দীর্ঘ জীবনের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে শহরবাসী শতায়ুর চেয়ে গ্রামে বাস করে এমন শতায়ু অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ বেশি, এছাড়া শতায়ুদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলের বাসিন্দা। এসব পাহাড়ী এলাকার বিশুদ্ধ মুক্ত হাওয়া স্বভাবতই স্বাস্থ্যময় দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। এছাড়া আজীবন কায়িক শ্রম, নিয়মিত জীবনের ছন্দ, পরিমিত সুষম প্রথাসিদ্ধ খাদ্য, প্রশান্ত ও প্রফুল্ল জীবন এ সবই শতায়ু হবার অনুকূল।

বার্ধক্যে যে সব বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, শিরাসংকোচ, হরমোন নিঃসরণের ক্ষীণতা, এসবের প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা স্বাস্থ্যসম্মত জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে অকাল বার্ধক্যের সম্ভাবনা রোধ করা। আর অবধারিত যে বার্ধক্য আয়ত্তের অতীত তার জন্যে আগে থেকেই তৈরি হওয়া। বার্ধক্য মানেই নিঃসঙ্গ আর নিরানন্দ জীবনের অভিশাপ নয়, সক্রিয় সুস্থ জীবনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যের জীবনও হয়ে উঠতে পারে যথেষ্ট অর্থবহ।

বার্ধক্য মানুষকে দেয় জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘনীভূত সমাবেশ। তাই জীবনের শেষ পাদে পৌঁছেও শ্রম ও জ্ঞানের চর্চা করতে বা নবীন সমাজকে সেই জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার অংশীদার করতে কোন

বাধা নেই। তবে এমন অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্যে স্বভাবতই সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে যথাযথ যত্নের ব্যবস্থা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও শ্রমের মূল্য দেবার।

কী আছে ভবিষ্যতে? ইতিমধ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম রক্ত, কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম বৃক্ক, কৃত্রিম হৃৎপিন্ড—এমনি সব মানবদেহের নানা প্রত্যঙ্গ। কে জানে হয়ত বা ভবিষ্যতে দেখা দেবে কৃত্রিম মস্তিষ্কও। কিন্তু তবু মানুষের অমরত্ব লাভের স্বপ্ন কি কোনদিন সার্থক হবে? খুব সম্ভব ব্যক্তিমানুষের দেহের অমরত্ব লাভ বাঞ্ছনীয়ও হবে না। কেননা জীবন অনিত্য জানি বলেই বুঝি আমরা জীবনকে এত ভালবাসি!

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যক্তিমানুষের অমরত্বের অর্থহীনতা উপলব্ধি করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনীতে আছেঃ বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আশ্চর্য কী?" যুধিষ্ঠির জবাবে বললেনঃ "মানুষ নিয়তই মারা যাচ্ছে, তবু যারা বেঁচে থাকে তারা ভাবে তারা চিরকাল বাঁচবে!"

গ্রীক উপকথার দেবী ইয়স (রোমানদের দেবী অরোরা) দেবরাজ জিউসের কাছে বর চাইলেন, তাঁর প্রেমিক টিথোনাস যেন অমর হয়। কিন্তু তিনি তো তার জন্যে চিরযৌবন চাননি, তাই অথর্ব জরাগ্রস্ত টিথোনাসকে বন্দী করে রাখতে হল ঘরে। তারপর একদিন এই অকর্মণ্য বৃদ্ধের নিরন্তর নালিশ অসহ্য হয়ে ওঠায় ইয়স তাকে বানিয়ে দিলেন একটি ঘুর্ঘুরে পোকা!

তাই অনন্ত জীবন নয়, অথর্ব বার্ধক্যও নয়; বিজ্ঞানের লক্ষ্য দীর্ঘ সজীব কর্মময় জীবনের সুযোগ সৃষ্টি করা; যে সম্ভাবনা নিয়ে মানুষের জন্ম তার পূর্ণ বিকাশের আর পরিণতির নিশ্চয়তা দেয়া। এই নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের নিয়মকানুন আরো ভাল করে জেনে, প্রকৃতির নিয়মকানুনকে সর্বাংশে মানুষের প্রয়োজনে নিয়োগ করে। এপথেই এগিয়ে চলেছে আজকের জরা-বিজ্ঞান।

আরো প্রচুর খাদ্য চাই

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনের লোকসংখ্যা একশ' কোটির ওপরে। সেদেশের বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন বর্তমান হারে প্রত্যেক নারীর যদি গড়ে তিনটি সন্তান হতে থাকে তাহলে আজ সারা পৃথিবীতে যত লোক, একশ' বছর পরে শুধু চীনদেশের জনসংখ্যাই হয়ে দাঁড়াবে তার সমান। তাই সেখানে চালু হয়েছে নতুন শ্লোগান ঃ "ছেলে হোক মেয়ে হোক, একটি সন্তানই যথেষ্ট।" চীনের বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, এ হারেও আগামী পঁচিশ বছর ধরে চীনের লোকসংখ্যা বেড়েই চলবে, তারপর শুরু হবে কমা।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার সমস্যা চীনের চেয়েও জটিল। শুধু যে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সে দেশের চেয়ে বেশি তা নয়, চীনে বিস্তীর্ণ জমি রয়েছে এখনো অনাবাদী, অথচ আমাদের দেশে ইতিমধ্যে চাষের উপযোগী প্রায় সব জমিই এসেছে লাঙলের নিচে। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্যে যেটুকু বনভূমি থাকা দরকার একে তা আমাদের নেই, তার ওপর যেটুকু বনভূমি আছে, জ্বালানি কাঠের আর চাষের জমির প্রয়োজনে তাও রক্ষা করা হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা আজ শুধু চীন আর বাংলাদেশের সমস্যা নয়। সারা দুনিয়া জুড়েই এই বিশাল সমস্যা যেন সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মতো অনিবার্য গতিতে এগিয়ে আসছে। তার সাথে সাথে আসছে ক্রমবর্ধমান খাদ্য-সংকট। অধিকাংশ দেশে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে এগোতে পারছে না। তাই খাদ্যাভাব, অপুষ্টি আর অনাহারের সমস্যা ক্রমেই প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে।

দুনিয়ার জনসংখ্যা বাড়ছে আজ মোটামুটি বছরে শতকরা দু'ভাগ হারে। সব দেশে যে একই ভাবে বাড়ছে তা নয়। উন্নত সমৃদ্ধ দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা এক ভাগের নিচে—অনেক দেশে

শ্ন্যের কাছাকাছি। বাংলাদেশের মতো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে এই হার শতকরা প্রায় তিন ভাগের কাছাকাছি। পৃথিবীর জনসংখ্যা একশ' কোটি পেরিয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম দিকে, আর দু'শ' কোটিতে পৌঁছয় বিশ শতকের শুরুতে। তারপর জনসংখ্যা তিনশ', চারশ' আর পাঁচশ কোটির অঙ্ক পেরিয়েছে বিশ শতকের মধ্যে। এই হারে চললে বিশ শতক শেষ হবার আগেই পৃথিবীর জনসংখ্যা ছ'শ' কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

এই অবস্থার নাম দেয়া হয়েছে 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ'। অনেকে একে চিহ্নিত করেছেন দুনিয়াব্যাপী ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসেবে। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়েও আতঙ্কিত হয়েছেন অনেকেই। কেননা পৃথিবীর বস্তুসম্পদ সীমাবদ্ধ। ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ বাস করছে ক্ষুধার সীমার নীচে। প্রতিদিন অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে প্রায় বিশ হাজার লোক ; কারো কারো হিসেবে এই অঙ্ক এর তিন গুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারে রাশ টানতে না পারলে দুনিয়া জোড়া অনেক সমস্যারই সমাধান হবে দুঃসাধ্য। হয়তো দেখা দেবে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। আসবে দেশে দেশে হানাহানি বা যুদ্ধ—কোটি কোটি মানুষ ঢলে পড়বে শীতল মৃত্যুর কোলে। বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীর এমনি অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরছেন।

সুখের বিষয় সব বিজ্ঞানীই তা বলে এমন নিরাশাজনক অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবি আঁকছেন না। প্রায় সব দেশেই চেষ্টা চলেছে পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যাকে দেশের বস্তুসম্পদের সঙ্গতির মধ্যে রাখতে। তার সাথে উদ্যোগ শুরু হয়েছে দুনিয়া জুড়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞানের আশ্চর্য শক্তিকে কাজে লাগাতে। আর এই উদ্যোগে বিস্ময়কর সাফল্যও এসছে ইতিমধ্যে।

কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কৌশল জানতে হলে আগে জানতে হবে খাদ্য কি? কিভাবে তৈরি হয় খাদ্য? আর এই খাদ্য তৈরির পদ্ধতিকে কি করে প্রভাবিত করা যায়?

মানুষের বেঁচে থাকা আর দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্যে শক্তির দরকার। সে শক্তি আসে খাদ্য থেকে। আমাদের মত উষ্ণ দেশে মাথাপিছু এই শক্তির দৈনিক চাহিদা ধরা হয়ে থাকে গড়পড়তা ২৫০০ কিলোক্যালরি

(অবশ্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ খাদ্য থেকে গড়পড়তা শক্তি পায় এর চেয়ে ঢের কম)। এই শক্তির পরিমাণ এক পাউন্ড মোটামুটি ভাল জাতের কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তার সমান। দেড় পাউন্ড (৭০০ গ্রাম) চাল বা গম খেলেও দেহে পাওয়া যায় এই পরিমাণ শক্তি।

একটা ৭০-ওয়াট শক্তির বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে প্রতি মিনিটে মোটামুটি এক কিলোক্যালরি শক্তি ক্ষয় হয় ; এটা একটা ঘুমন্ত মানুষের শক্তিব্যয়ের সমান। আস্তে আস্তে হাঁটলে একজন মানুষের শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ এর দ্বিগুণ হয়। জোরে হাঁটলে হয় প্রায় চারগুণ।

মানুষের মাংসপেশীর দক্ষতা মোটামুটি পঁচিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ। অর্থাৎ একজন বয়স্ক ব্যক্তি খাদ্য থেকে যে রাসায়নিক শক্তি গ্রহণ করে তার এক-তৃতীয়াংশের মতো কাজে পরিণত হয়, বাকিটা চারপাশে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তাপের আকারে।

অবশ্য খাদ্য আমাদের দেহে শুধু যে কাজের জন্যে রাসায়নিক শক্তি সৃষ্টি করে তাই নয়, দেহ গঠনের জন্যে নানা প্রয়োজনীয় উপাদানও যোগায়। তাপশক্তি পাই আমরা প্রধানতঃ শর্করা আর তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য থেকে ; দেহ গঠনের জন্যে নানা রকম অ্যামাইনো অ্যাসিড পাই আমিষ জাতীয় খাদ্য থেকে ; এছাড়া পাই ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় খনিজ বস্তু।

আমাদের শরীরের জন্যে দরকারী এসব বস্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবই আসে উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ হাওয়া থেকে নেয় কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অর্থাৎ কারবন আর অক্সিজেন ; শেকড়ের সাহায্যে মাটির রসের পানি থেকে নেয় হাইড্রোজেন (পানির অক্সিজেন উদ্ভিদ হাওয়ায় ছেড়ে দেয়)। এ ছাড়া মাটির রস থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করে আরো বার-তেরটি উপাদান—তার মধ্যে প্রধান হল নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, দস্তা ও তামা।

এ সব মৌল উপাদান সংগ্রহ করে তাদের মানুষের উপযোগী খাদ্যবস্তুতে পরিণত করতে দরকার রাসায়নিক শক্তি, আর এ জন্যে প্রধান শক্তিকেন্দ্র হল উদ্ভিদের সবুজ পাতা। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে পাতার ভেতরকার পত্রহরিৎ নামে এক ধরনের সবুজ কণিকা। পত্রহরিতের আছে এক আশ্চর্য ক্ষমতা ঃ সূর্যকিরণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এরা হাওয়ার কারবন ডাই-অক্সাইড আর পানির হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে প্রথমে গ্লুকোজ তৈরি করে, তাতেই জমা হয় শক্তি। তারপর ক্রমে ক্রমে এই শক্তি

কাজে লাগিয়ে গাছে সৃষ্টি হয় শ্বেতসার-শর্করা, সেলুলোজ, তেল, প্রোটিন ইত্যাদি আরো নানা জটিল রাসায়নিক বস্তু। আলোর সাহায্যে রাসায়নিক সংশ্লেষ ঘটানো হয় বলে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ।

সালোক-সংশ্লেষে সরল রাসায়নিক বস্তুকে জটিল বস্তুতে পরিণত করতে যে শক্তি দরকার তা আসে গোড়ায় সূর্যকিরণ থেকে। গাছের পাতা, ফল বা শেকড়ে জমা থাকে এই শক্তি—তাকেই আমরা গ্রহণ করি খাদ্য হিসেবে। অর্থাৎ এক হিসেবে বলতে গেলে খাদ্য হল প্রধানতঃ রাসায়নিক কৌশলে জমিয়ে রাখা সূর্যের শক্তি।

খাবার খেলে মানুষের শরীরে তা হজম হবার সময় ভেঙে আবার সরল বস্তুতে পরিণত হয়। শ্বাসের সাথে নেয়া অক্সিজেনের সাথে খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক যোগ ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যে বন্দী হয়ে থাকা রাসায়নিক শক্তি মুক্তি পায়। আমাদের দৈহিক বা মানসিক কাজের শক্তি আসে এ থেকেই। দেহে যে শুধু জটিল বস্তুর ভাঙ-চুর ঘটে তা নয়, নানা সরল বস্তুর মিলনের ফলে জটিল বস্তু সৃষ্টি হয়ে দেহ গঠনও ঘটে। বলা বাহুল্য এতেও আবার কিছু শক্তি ব্যয় হয়।

সূর্যকিরণের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ পৃথিবীর বুকে পড়ে ; বাকিটা ছড়িয়ে যায় মহাশূন্যে। আবার পৃথিবীতে যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পৌঁছয় তারও মাত্র দু'লক্ষ ভাগের এক ভাগ মানুষের জন্যে খাদ্য তৈরিতে কাজে লাগে।

গাছের পাতায় যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পড়ে তার শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ পাতা শুষে নেয় ; কিন্তু তার মধ্যে সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে কাজে লাগায় মাত্র এক শতাংশ বা তারও কম। কোন কায়দায় যদি পত্রহরিতের দক্ষতা বাড়ানো যায় তাহলে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে পারে। মানুষ বহু কাল থেকে খুঁজছে খাদ্য বাড়াবার নানা উপায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ভাল করে বোঝার, বুঝে তাকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে।

আসলে আদিম মানুষের বনজঙ্গল থেকে কুড়িয়ে খাদ্য সংগ্রহ করা ছিল অপরিকল্পিতভাবে উদ্ভিদে সঞ্চিত সূর্যের শক্তির ব্যবহার। চাষাবাদের আবিষ্কারের প্রক্রিয়া হল মূলত পরিকল্পিত উপায়ে ব্যাপক আকারে সূর্যের শক্তিকে বন্দী করে তাকে কাজে লাগানো। স্বভাবতই হাজার হাজার বছরের

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন সব গাছপালাই চাষের জন্যে বেছে নিয়েছে যাতে সূর্যের শক্তি সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি ; যার চাষ অপেক্ষাকৃত সহজে, কম সময়ে ব্যাপক আকারে করা যায়, আর যার ফল বা ফসল সহজে সংরক্ষণ করা যায় দীর্ঘ কাল ধরে।

পৃথিবীতে সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে প্রায় আড়াই লাখ প্রজাতির। কিন্তু তাদের শুধু একটি গোত্র (বা পরিবার) অর্থাৎ ঘাস গোত্রের দশ-বার রকম উদ্ভিদ থেকেই মানুষ তার অধিকাংশ খাদ্যশস্য যোগাড় করে। এই ঘাস গোত্রে পড়ে ধান, গম, ভুট্টা, যব, রাই, জোয়ার, কাওন, বাজরা ইত্যাদি। ঘাস গোত্রের বাইরে যে সব উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য যোগায় তার মধ্যে পড়ে আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভা, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল, ডাল, শিম, সয়াবীন ইত্যাদি।

যেসব জাতের গাছ থেকে সহজে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়, মানুষ যে শুধু সেগুলো বাছাই করে চাষের কাজে ব্যবহার করতে শিখেছে তাই নয়, একই ধরনের গাছকেও বাছাই করে করে দরকার মতো তার জাত (ভ্যারাইটি) বদলাতেও শিখেছে। বুনো ধান আর চাষের ধান হুবহু এক নয়। ধান আছে প্রায় ত্রিশ হাজার জাতের। তার মধ্যে আমাদের দেশে জন্মায় মোটা-মুটি আট-দশ হাজার জাতের ধান। যেগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ায় বেশি খাপ খায় আর ভাল ফসল দেয়, সেগুলোরই চাষ করে লোকে। তেমনি গমেরও বহু পরিবর্তন হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। এযাবৎ প্রায় ষাট হাজার জাতের গমের হদিস পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে আজকাল চাষ হয় মাত্র অল্প কয়েক জাতের গম।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পাতা সাজাবার ধরনের ওপর ফসলের ফলন অনেকটা নির্ভর করে। পাতা যদি হয় এমনভাবে সাজানো যাতে সূর্যের আলো পাতায় বেশি করে পড়ে, তা হলে তাতে সালোক-সংশ্লেষ ঘটে বেশি ; কাজেই ফলনও বাড়ে। এ ছাড়া পাতার রঙ যদি হয় ঘন সবুজ, অর্থাৎ পাতায় যদি পত্রহরিৎ বেশি থাকে তাহলেও পাতা আলো শোষে বেশি, তাতে বেশি খাদ্য তৈরি হয়।

প্রকৃতিতে একই জাতের উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে কোন কোনটাতে আপনা আপনি কিছু গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে। কোনটা হয় আকারে বড়, কোনটা ছোট ; কোনটার রঙে বা অন্যান্য গুণাগুণেও তারতম্য দেখা দেয়। পছন্দসই গুণাগুণযুক্ত নমুনা বেছে নিয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধি করলে এসব বাঞ্ছিত গুণাগুণের কিছু কিছু পরবর্তী পুরুষে টিকে যায়। নব্য প্রস্তর

যুগের মানুষ বহু হাজার বছর ধরে এমনি নির্বাচনের মাধ্যমে বহু গাছ-পালার উন্নতি ঘটিয়েছে।

ক্রমাগত বাছাই-এর মধ্য দিয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছে উন্নত জাতের উদ্ভিদ, তেমনি উদ্ভব ঘটেছে উন্নত জাতের প্রাণী। বুনো মুরগির তুলনায় উন্নত জাতের পোষা মুরগির আকার অনেক বড়, মাংস সুস্বাদু; কোন কোন জাতের মুরগি বছরে ডিম দেয় সাড়ে তিনশো বা তার ওপরে। সাধারণ গাভীর তুলনায় উন্নত জাতের গাভী দুধ দেয় পনের-বিশ গুণ বেশি—বছরে একশ'-দেড়শ' মন পর্যন্ত।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে চেকোস্লোভাকিয়ার (তখন অস্ট্রিয়া) পাদ্রী উদ্ভিদবিদ গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২-৮৪) এমনি গাছপালার প্রাকৃতিক নির্বাচনকে মানুষের ইচ্ছেমতো প্রভাবিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখালেন একই প্রজাতির বিভিন্ন গুণাগুণযুক্ত উদ্ভিদের মিলন ঘটিয়ে সংকর সৃষ্টি করলে তাতে দুপক্ষের গুণাগুণের যোগ হয়; আর এই যোগ ঘটার নিয়ম কানুনও বের করলেন তিনি। পরবর্তী জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, সংকর সৃষ্টি করে এবং তা থেকে বাছাই করে মানুষের ইচ্ছেমতো গুণাগুণের উদ্ভিদ বা প্রাণী জন্মানো যায়। সৃষ্টি হল সুপ্রজননতত্ত্ব নামে এক যুগান্তকারী বিজ্ঞান। আজ আমরা জেনেছি, এসব গুণাগুণের গোড়ায় রয়েছে জীবকোষের ক্রোমোজোমে 'জীন' বা বংশাণু নামে অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের একক। এই জীন হল আবার ডি. এন. এ. নামে এক জটিল রাসায়নিক অণু দিয়ে তৈরি।

এই শতকের মাঝামাঝি ফসল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুপ্রজননতত্ত্বের প্রয়োগে বিপ্লব ঘটে মেক্সিকোর কৃষিতে। চল্লিশের দশকে মেক্সিকোর কৃষি ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত নীচু মানের। গমের ফলন হত প্রতি হেকটেয়ারে (এক হেকটেয়ার প্রায় আড়াই একরের সমান) গড়ে এক টনের কম—মাত্র ৭৫০ কিলোগ্রাম। দেশে গমের চাহিদার অর্ধেক আমদানী হত বিদেশ থেকে। এই মেক্সিকোর কৃষিব্যবস্থার উন্নতির ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্যে সে দেশের সরকারের আমন্ত্রণে রকফেলার ফাউন্ডেশন ১৯৪৪ সালে পাঠালেন চারজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। এঁরা পরীক্ষা শুরু করলেন গমের ফলন বাড়ানো নিয়ে। উন্নত গমের জাত সৃষ্টি, সার প্রয়োগ, কীট নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ভিদের রোগ দমনের এক সমন্বিত প্রকল্প হাতে নেয়া হল।

বিজ্ঞানীরা নানা রকম পরীক্ষা থেকে দেখলেন ফসল কম হবার একটা বড় কারণ হল বেশির ভাগ জমিতে সারের ঘাটতি। তাঁরা জমিতে নাইট্রোজেন সার দিয়ে ফলন বাড়াতে চেষ্টা করলেন। ভাল জাতের বীজ আর যথেষ্ট সার ব্যবহারে গমের শিষ ধরল অনেক। কিন্তু গাছ লম্বা হয়ে ওঠার ফলে নরম কান্ড বইতে পারল না সে শিষের ভার; গম পাকার আগেই নুয়ে পড়ল বেশির ভাগ গাছ। নুয়ে পড়া কান্ড ভেঙে যাওয়ায় শেকড় থেকে শিষে আর পুষ্টি রস পৌঁছতে পারে না, কাজেই নষ্ট হয় ফসল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে জাপানে একজন মার্কিন বিজ্ঞানী দেখতে পান এক অদ্ভুত বেঁটে বামন গম গাছ যার কান্ড রীতিমতো খাটো আর শক্ত। কৌতূহলের বশে তার ক'টি বীজ নিয়ে এসে তিনি দেশে লাগালেন; তা থেকে জন্মাল আধা-বামন গম গাছ। এই বেঁটে গম গাছের খোঁজ পেয়ে মেক্সিকোতে যে সব বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন তাঁরা এর বীজ লাগালেন সেখানে; তারপর এর সাথে সংকর ঘটাতে লাগলেন সে দেশের নানা জাতের গমের। সৃষ্টি হল নতুন জাতের আধা-বামন গম গাছ যা নানা ঋতুতে অর্থাৎ নানা রকম তাপমাত্রায় আর ছোট বড় নানা দৈর্ঘ্যের দিনে জন্মানো যায়। সবচেয়ে বড় কথা এর কান্ড হল সেই জাপানী গম গাছের মতো মজবুত; অর্থাৎ শিষের ভারে গাছের নুয়ে পড়ার সমস্যার সমাধান হল। এবার গমের ফলন আশাতীত দ্রুত বাড়তে লাগল।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে মেক্সিকোতে গমের ফলন বছরে ৩ লক্ষ টন থেকে বেড়ে হল ২৬ লক্ষ টন—অর্থাৎ আট গুণের ওপরে। প্রতি হেকটেয়ার জমির ফলন ৭৫০ কেজি থেকে চারগুণের বেশি বেড়ে দাঁড়াল ৩২০০ কেজি। একই পদ্ধতিতে সে দেশের প্রধান খাদ্য শস্য ভুট্টার উৎপাদন বছরে ৩৫ লক্ষ টন থেকে বেড়ে হল ৯০ লক্ষ টন। ১৯৬৫ সালে মেক্সিকোর এই নতুন জাতের গম এল ভারতে। সেখানে এই গমের ফলন হল দেশী গমের তুলনায় দশ গুণ বেশি। এ থেকেই চালু হল "সবুজ বিপ্লব" কথাটা। মেক্সিকোতে গমের ফলন বাড়াবার এই প্রকল্পে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন ডঃ নরমান বরলগ। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এই অবদানের জন্যে তিনি ১৯৭০ সালে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ষাটের দশকের শুরুতে এমনি প্রচেষ্টা শুরু হল ধানের ফলন বাড়াবার জন্যে। রকফেলার ফাউন্ডেশন আর ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ১৯৬০ সালে ফিলিপাইনে প্রতিষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্‌সিস্টিটিউট (I.R.R.I.)। বিজ্ঞানীরা দেখলেন সাধারণ ধান গাছ ৫-৬ ফুট লম্বা। জমিতে বেশি সার দিলে ফলন বাড়ে বটে কিন্তু গমের মতোই তাতে ছড়ার ভারে সরু কান্ড নুয়ে ভেঙে পড়ে। তাঁরা এমন সংকর সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন যা সার প্রয়োগে বেশি ফলন দেবে অথচ শিষের ভারে কান্ড নুয়ে পড়বে না।

ধান গাছে সংকর ঘটাতে হলে ফুলের পুংকেশর পুষ্ট হবার আগেই একটি গাছের সবগুলো ফুলের পুংকেশর ছিঁড়ে ফেলে শুধু গর্ভকেশর রাখা হয়। এর পর তার ওপর অন্য জাতের ফুল থেকে পুংকেশরের পরাগ-রেণু ঝেড়ে দেয়া হয়। এর ফলে নতুন যে সংকর ধান জন্মায় তার গুণাগুণে প্রকাশ পায় বাপ-ধান আর মা-ধানের গুণাগুণের মিশেল। তারপর কয়েক পুরুষের ধানের মধ্যে থেকে দরকারী গুণাগুণযুক্ত ধান বেছে নিতে হয়। যেমন, কোন ধানের হয়তো ফলন হল বেশি, কিন্তু দেখা গেল সেটা পোকা মাকড়ের আক্রমণ বা রোগবালাই তেমন ঠেকাতে পারে না। কোন জাত হয়তো পাকতে সময় লাগে কম; কোন জাত সার বা পানির ঘাটতি অনেকটা সামলে নিতে পারে। বিভিন্ন আবহাওয়া, বিভিন্ন ধরনের জমি, বিভিন্ন রকম পোকামাকড় বা রোগজীবাণুর সাথে খাপ খাওয়াবার জন্যে প্রজননবিদরা নানা জাতের ধানের সংকর ঘটিয়ে নানা প্রয়োজনীয় গুণাগুণযুক্ত ফসল সৃষ্টি করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্‌সিস্টিটিউটের উচ্চ ফলনশীল ধান 'আই-আর ৮' (বা ইরি-৮) ১৯৬৬ সালে চালু হয়ে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। এই ধানের উচ্চতা তিন ফুটের মতো; প্রতি একরে তিন মন নাইট্রোজেন সার দিলেও গাছ নুয়ে পড়ে না। খাড়া, শক্ত, পুরু আর গাঢ় সবুজ রঙের পাতায় সালোক-সংশ্লেষের দক্ষতা সাধারণ ধানের পাতার চেয়ে তিন-চারগুণ বেশি। যথেষ্ট সার আর যত্ন পেলে প্রতি একরে এর ফলন হয় একশ' মণের ওপর। নানা ধরনের আবহাওয়া, পোকামাকড় বা রোগ-বালাই এর তেমন ক্ষতি করতে পারে না। নতুন নতুন জাতের ইরি ধান সৃষ্টির ফলে ফিলিপাইনের কৃষিতে এমন বিরাট পরিবর্তন এল যে পঞ্চাশ বছরে ফিলিপাইন প্রথম ধান রপ্তানী করল ১৯৬৮ সালে।

এই বছরই নতুন জাতের ইরি ধান এল বাংলাদেশে। ইরি-৮ এদেশে

আউশ আর বোরো চাষের জন্যে উপযোগী প্রমাণিত হল। কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ ধানী জমিতে চাষ হয় রোপা ধান; এ রকম জমির উপযোগী ইরি-২০ এল তার পরের বছর; একে জলী বা রোপা আমন দু'ভাবেই ব্যবহার করা চলে। এই ধানের নাম দেয়া হল ইরিশাইল। ইতিমধ্যে জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠা করা হল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌সস্টিটিউট। এখানে প্রজনন বিজ্ঞানীরা নানা জাতের দেশী-বিদেশী ধানের সংকর ঘটিয়ে উদ্ভাবন করতে শুরু করলেন নতুন জাতের ধান। তার মধ্যে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ছাড়া বিপ্লব (বি-আর ৩) আর ব্রিশাইল (বি-আর ৪) ধান চাষীদের কাছে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হল। এই দু'জাতের ধানের ফলন সাধারণ ধানের চেয়ে তিন-চারগুণ বেশি। তাছাড়া এরা রোগবালাই পোকামাকড়েও নষ্ট হয় কম।

নতুন জাতের ধানের চারা লম্বায় খাটো বলে রোয়া লাগাবার সময় জমিতে বেশি পানি থাকলে চারা নষ্ট হয়। অথচ বাংলাদেশের প্রচুর জমি বর্ষার শেষে রোপা আমন লাগাবার সময় পানিতে ডুবে থাকে। এজন্যে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন এমন জাতের ধান উদ্ভাবন করতে যা রোপা আমন হিসেবে বর্ষার শেষে খেতে ১০-১২ ইঞ্চি পানিতে লাগালেও নষ্ট হয় না, রোগবালাইতে সহজে কাবু করতে পারে না, আর অল্প সময়ে পাকে। সৃষ্টি হল আরো নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান।

ধান পাকার সময় কমিয়ে ১০০ দিনের মধ্যে আনা হলে সে ধানে বছরে তিনটে ফসল তোলা যেতে পারে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মানো যায়, ঠান্ডা বা খরা সইতে পারে, গভীর পানিতে জন্মাতে পারে, আর খেতে সুস্বাদু হয় এমনি গুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল ধান সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। আমন মৌসুমে আবাদ করা যায় আর লম্বা চারা হয় তেমন উচ্চ ফলনশীল ধানের দুটো জাত বি, আর-১০ (প্রগতি) ও বি, আর-১১ (মুক্তা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্‌সস্টিটিউট ইতিমধ্যেই উদ্ভাবন করেছে। অজ বাংলাদেশে ধানের জমির মোটামুটি ২০ শতাংশে নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান লাগানো হচ্ছে, আর এসব জমিতে ফলন হচ্ছে দেশের মোট ধানের ফলনের মোটামুটি ৪০ শতাংশ।

দেশী ধানে গাছ লম্বা হয় বলে ধানের চেয়ে খড় হয় ওজনে দ্বিগুণ। আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ধান গাছে ফসল আর খড়ের পরিমাণ হয় মোটামুটি সমান সমান। অর্থাৎ পত্রহরিৎ সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে যে পরিমাণ সূর্যকিরণ বন্দী করে, এ ধরনের গাছ তার মধ্যে একটা বড় অংশ

কাজে লাগায় মানুষের জন্যে খাবার তৈরিতে। এছাড়া সাধারণ ধানে প্রোটিনের ভাগ যতটা কোন কোন নতুন জাতের ধানে প্রোটিনের অংশ তার চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশে মোট চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ মোটামুটি ২.৯০ কোটি একর। তার মধ্যে ধান চাষ হয় ২.৪০ কোটি একরে। কৃষি বিজ্ঞানী-দের মতে রোপা আমনের ৯০ লাখ একর, বোরো ২০ লাখ একর আর আউশ ৮০ লাখ একরে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা সম্ভব। এছাড়া গভীর পানির ধান জন্মায় প্রায় ৫০ লাখ একর জমিতে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২.৪০ কোটি একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহারের ফলে যদি একর প্রতি গড়ে ৪০ মণ বা দেড় টন ধান জন্মায় তাহলে বাংলাদেশে বছরে ধানের উৎপাদন হবে ৩.৬০ কোটি টন—আমাদের বর্তমান ধান উৎ-পাদনের দুগুণের বেশি। এছাড়া ৮০ লাখ একর জমিতে যথেষ্ট পানি সরবরাহের ফলে বছরে অন্ততঃ দুটো ধানের ফসল হতে পারে। তাহলে মোট ধানের উৎপাদন বাড়তে পারে প্রায় তিন গুণ।

আর শুধু তো ধানের উৎপাদন বাড়ানো নয়। দেশের মানুষের পুষ্টির সমস্যা মেটাতে হলে চাই আরো নানা ফসলের বিকাশ। বাড়াতে হবে গম, তেলবীজ, ডাল, মশলা, তামাক, নানা ধরনের তরিতরকারির উৎপাদনও। এসব ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন।

তা ছাড়া নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল উন্নত বীজ উদ্ভাবনেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত হয় না। এসব বীজ যথাসময়ে যথাযথভাবে চাষীদের কাছে পৌঁছবার ব্যবস্থাও দরকার। সাধারণত এসব জাতের বীজের জন্যে প্রচুর সার আর পানির দরকার হয়। চাই তারও যথাযোগ্য ব্যবস্থার আয়ো-জন। ভাল জাতের বীজ, সার, কীটনাশক, নলকূপ, সেচ পাম্প এসব সরবরাহের ক্ষেত্রে সচরাচর অপেক্ষাকৃত ধনী চাষীরাই সুবিধে পেয়ে থাকে। যে দেশে অধিকাংশ কৃষক জমির মালিক নয়, বা কৃষকরা অশিক্ষিত, সেখানে কৃষিবিপ্লব সফল হওয়া দুঃসাধ্য। ভূমি সংস্কার না ঘটায় প্রাথমিক চমক লাগানো সাফল্যের পর মেক্সিকোতে সবুজ বিপ্লব থমকে গিয়েছে সত্তরের দশকে এসে।

কৃষি বিপ্লবের জন্যে তৈরি করা দরকার যথেষ্ট কৃষি কর্মী ; কৃষকদের নতুন কৃষিব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ দেবার, উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা চাই। রাসায়নিক সারের সাথে সাথে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করা না হলে জমির গুণাগুণ কমে যায়। কোন্ সার কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, তাও

শিখতে হবে। চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সারা দেশকে করে তুলতে হবে সচেতন।

ধরা গেল ফসলের জাত উন্নত করার ফলে দুনিয়ার সব দেশেই ফলন প্রচুর বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার জমি তো সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই পতিত থাকা আবাদী জমির পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সারা দুনিয়ার সব জমি যদি চাষের আওতায় আনা যায় তাহলে কত লোকের খাদ্য সংস্থান হতে পারে?

কিছুদিন আগে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের জবাব বের করার জন্যে আন্তর্জাতিক জরিপ চালিয়েছেন। এই জরিপ থেকে তাঁরা হিসেব করে বলেছেন, সারা দুনিয়ায় যতটা চাষের উপযোগী জমি আছে তা যদি পুরোপুরি ফসল ফলাবার জন্যে ব্যবহার করা যায় তাহলে দুনিয়ার অন্তত পাঁচ হাজার থেকে ছ'হাজার কোটি লোকের অর্থাৎ আজকের চেয়ে অন্ততঃ দশ-বার গুণ বেশি লোকের খাদ্য সংস্থান হওয়া সম্ভব। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের হিসেবে ভুল বের করা শক্ত।

আমরা আগেই দেখেছি, দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্যে মানুষের সর্বনিম্ন শক্তির চাহিদা মাথাপিছু গড়পড়তা ২৫০০ কিলোক্যালরি। কঠিন কাজকর্ম করা আর শরীরের পুষ্টির জন্যে দরকারী উন্নত মানের প্রোটিন প্রভৃতি খাবার সরবরাহের জন্যে এই শক্তির চাহিদা বেড়ে দাঁড়ায় মাথাপিছু দৈনিক ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ কিলোক্যালরি।

আজকাল আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে জমির মাপ উল্লেখ করা হয় হেক্‌টেয়ারের হিসেবে; এক হেক্‌টেয়ার প্রায় আড়াই একরের সমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির জন্যে যে মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তাতে প্রতি হেক্‌টেয়ারে খাদ্য ফলে বছরে ৬ মেট্রিক টন বা ৬০০০ কিলোগ্রাম। এটা দৈনিক ৬০,০০০ কিলোক্যালরি খাদ্য-শক্তির সমান। অর্থাৎ এক হেক্‌টেয়ার জমি থেকে মানুষের নিম্নতম দৈহিক চাহিদার হিসেবে ২৪ জনের আর বাঞ্ছিত চাহিদার হিসেবে ১২ থেকে ১৫ জনের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ হতে পারে। এই হিসেব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমমানের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলে আমাদের দেশে প্রতি একরে ছ'জনের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। অর্থাৎ বাংলাদেশের খাদ্যশস্য চাষের উপযোগী

প্রায় আড়াই কোটি একর জমি পুরোপুরি ফসল ফলানোর জন্যে ব্যবহার করলে বছরে অন্ততঃ ১৫ কোটি লোকের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন সম্ভব।

সারা পৃথিবীতে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ কত তারও হিসেব করা হয়েছে। দক্ষিণ মেরু আর গ্রীনল্যান্ডের চিরতুষার এলাকা বাদ দিলে পৃথিবীর স্থলভাগ মোটামুটি ১৩০০ কোটি হেক্টেয়ার। এর মধ্যে ৪৫০ কোটি হেক্টেয়ার বাদ যাবে অতি শীতল, অতিউষ্ণ বা অতিশুষ্ক বলে; আর ৫৩০ কোটি হেক্টেয়ার বাদ যাবে পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি ভূ-প্রকৃতির কারণে। এর পর চাষের উপযোগী জায়গা থাকে ৩২০ কোটি হেক্টেয়ার। এই এলাকা পৃথিবীর স্থলভাগের এক-চতুর্থাংশ, বর্তমানে যে পরিমাণ জায়গায় চাষ হয় তার দ্বিগুণ; আর যে পরিমাণ জায়গা থেকে ফসল তোলা হয় তার তিন গুণ।

চাষের উপযোগী অনেক জমিতে অবশ্য পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকায় চাষ সম্ভব হয় না। কাজেই পৃথিবীতে চাষ করা সম্ভব এমন জমির পরিমাণ ৩০০ কোটি হেক্টেয়ার বলে ধরা যেতে পারে। এর মধ্যে কিছু এলাকায় এখনই বছরে দু'টি বা তিনটি ফসল ফলানো যায়; তাতে চষা জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬০ কোটি হেক্টেয়ার। আবার আর কিছু এলাকায় সেচ-সুবিধে বিস্তৃত করা হলে একাধিক ফসল ফলতে পারে। এগুলোতে সেচ-সুবিধের ব্যবস্থা করলে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৫৭০ কোটি হেক্টেয়ার।

এসব জমির সবটা যদি চাষ করা সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীতে কত লোকের খাদ্য সংস্থান হবে? বলা বাহুল্য পুরোপুরি সবটা জমিই শুধু খাদ্যশস্য জন্মাতে ব্যবহার করা যাবে না। মোট জমির শতকরা অন্তত দশ ভাগ দরকার হবে মৌলিক খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য শৌখিন খাবার এবং আরো নানা প্রয়োজনীয় ফসল—যেমন পাট, তুলা প্রভৃতি আঁশ, তামাক, চা, কফি ইত্যাদি জন্মাতে। তারপরও শতকরা দশ ভাগ ফসল নষ্ট হতে পারে পোকামাকড়ের জন্যে, গুদামে বা আনা-নেয়ায়, কিছু রাখতে হবে বীজের জন্যে। তারপর যে ফসল থাকে তাতে নিম্নতম চাহিদার ভিত্তিতে বাঁচতে পারে প্রায় ১০,০০০ কোটি লোক। মাথাপিছু ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ কিলোক্যালরি শক্তির চাহিদা ধরা হলে এই খাদ্যশস্য যথেষ্ট হবে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ কোটি লোকের জন্যে। চাষের জমি ছাড়াও প্রায় ৩৫০ কোটি হেক্টেয়ার জমি পশু চারণের উপযোগী, তা থেকে দুনিয়ার সব মানুষের

জন্যে মাংস, দুধ এসব পাওয়া যেতে পারে।

বলা বাহুল্য এসব তাত্ত্বিক হিসেব থেকে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব মনে হচ্ছে হয়তো কার্যক্ষেত্রে তা সব জায়গায় সম্ভব হয়ে উঠবে না। সম্ভাব্য চাষের জমির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ এমন এলাকায় যেখানে প্রায় সারা বছরই বৃষ্টি হচ্ছে। এসব এলাকায় কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ নানা কারণে দুঃসাধ্য। অনেক জমি তেমন উর্বর নয়; কাজেই এসব জমি থেকে বেশি ফসল পেতে হলে যথেষ্ট রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। এজন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, প্রয়োজন কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। অবশ্য রাসায়নিক সারের জন্যে যে ব্যয় হবে তার চেয়ে উৎপন্ন বাড়তি ফসলের দাম হবে অনেক বেশি। বিশ শতকের শুরুতে দুনিয়াতে রাসায়নিক সার উৎপন্ন হত প্রতি বছর মাত্র বিশ লাখ টন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই পরিমাণ দাঁড়ায় পঁচাত্তর লাখ টন। বিশ শতকের শেষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দাঁড়াবে বছরে অন্তত পনের কোটি টন।

এশিয়ার সম্ভাব্য জমির প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ আর ইউরোপে ৯০ ভাগের মতো এর মধ্যে লাঙ্গলের নীচে আনা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন মহাদেশে এখনও চাষের উপযোগী জমি পতিত রয়েছে যথেষ্ট। উত্তর আমেরিকায় মাত্র ৫৫ ভাগ, আফ্রিকায় ৩০ ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ায় আজও শতকরা ১৫ ভাগের কম জমি চাষ করা হচ্ছে। এসব অঞ্চলে পতিত জমি চাষ করা হলে ফলন বাড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দুনিয়ার বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে জমি থেকে ফলনের পরিমাণ আজ নিতান্ত কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োয়া রাজ্যে প্রতি হেক্‌টেয়ারে ভুট্টার ফলন গড়ে ৬ মেট্রিক টন (অর্থাৎ ৬০০০ কিলোগ্রাম)। অথচ বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে প্রতি হেক্‌টেয়ারে চাল বা গমের ফলন এক টনের সামান্য ওপরে। এই ফলন বাড়াবার জন্যে দরকার উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ, সার প্রয়োগ, পানি সরবরাহের মান উন্নত করা। পৃথিবীতে বিভিন্ন নদী দিয়ে যে পানি বয়ে যায় তার মাত্র শতকরা চার ভাগ আজ ব্যবহার করা হয় ফসলের খেতে জলসেচের জন্যে। আর এই জলসেচ হয় দুনিয়ার স্থলভাগের মাত্র শতকরা এক ভাগ এলাকায়।

এর ওপর রয়েছে কৃষি উৎপন্নের অপচয়ের সমস্যা। এক ধরনের অপচয়

ঘটছে উন্নত আর অনুন্নত দু'ধরনের দেশেই। সে হল ফসল ফলাবার জন্যে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় (চাষের জন্যে দৈহিক পেশী শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তি, সারের রাসায়নিক শক্তি, জলসেচের জন্যে ব্যবহৃত শক্তি) তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যয় হয় খাদ্যশস্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আনা-নেয়ায় আর খাবার তৈরিতে। যেমন, বাংলাদেশ বা ভারতে এক কিলোগ্রাম চাল রান্না করে ভাত তৈরিতে যে জ্বালানি শক্তি ব্যয় হয় তার পরিমাণ চাল থেকে দেহ যে শক্তি পায় তার দ্বিগুণ। আমাদের দেশে যে ধরনের মাটির চুলো ব্যবহার করা হয় তাতে জ্বালানি শক্তির মাত্র শতকরা দশ ভাগ কাজে লাগে, আর বাকিটা তাপের আকারে অপচয় হয়। চুলোর দক্ষতা সামান্য পরিমাণে বাড়ালেও প্রচুর জ্বালানি বাঁচত, সেই শক্তি কৃষিতে অন্য কাজে (যেমন জলসেচের জন্যে) লাগানো সম্ভব হত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষকেরা ফসল তৈরির জন্যে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে, তারপর সে ফসল থেকে শস্য মাড়াই, প্যাকেজ তৈরি, যাতায়াত, হিমায়ন, রান্না প্রভৃতিতে ব্যয় করে তার দ্বিগুণ শক্তি।

আরেক ধরনের অপচয় ঘটে প্রধানত উন্নত দেশে। সে হল খাদ্য থেকে শক্তি সংগ্রহ শস্যের মাধ্যমে না করে প্রধানত মাংস বা এ জাতীয় জটিলতর রাসায়নিক উৎপন্নের মাধ্যমে করা। এসব দেশে প্রচুর শস্য ব্যবহার করা হয় গৃহপালিত পশুর জন্যে। সচরাচর পশুকে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য খাওয়ানো হয় তার মাত্র শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগের মত পরিণত হয় মাংস বা অন্য আহার্য বস্তুতে—অর্থাৎ বাকি শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ শক্তির অপচয় ঘটে। চীনদেশে প্রতিটি লোককে সারা বছর পেট পুরে খাওয়াতে দরকার হয় ৪৫০ পাউন্ড খাদ্যশস্য। এর মধ্যে ৩৫০ পাউন্ড ব্যবহৃত হয় সরাসরি—অর্থাৎ খাদ্যশস্য হিসেবে, আর ১০০ পাউন্ড ব্যবহৃত হয় গৃহ-পালিত পশুর জন্যে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বছরে খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন দু'হাজার পাউন্ড। তার মধ্যে মাত্র ১৫০ পাউন্ড খাওয়া হয় খাদ্যশস্য হিসেবে (রুটি, নুডল্‌স্‌, কর্ণ-ফ্লেক্‌স্‌ প্রভৃতি আকারে) আর বাকি সবটা অর্থাৎ শতকরা ৯০ ভাগের ওপর খাওয়ানো হয় গৃহপালিত পশুকে মাংস, দুধ বা মাখনে পরিণত করার জন্যে।

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ যখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য পাচ্ছে না সেখানে খাদ্যশস্যকে মাংসে পরিণত করে দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাংস ভোগ বিলাসিতা বই কি! খাদ্যশস্য ব্যবহারের এই অপচয় বন্ধ করা গেলে দুনিয়া জোড়া ক্ষুধার জ্বালা অনেকখানি কমানো যেতে পারে। এতে

বিত্তবান আর রসনাবিলাসীদের খাদ্যে মাংসের হয়তো কিছুটা ঘাট্‌তি পড়বে কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার উদ্যোগ নিশ্চয়ই আরো জোরদার করা দরকার। কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ভাববার কারণ এখনও দেখা দিয়েছে বলে মনে হয় না। খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াবার নতুন নতুন পদ্ধতি আজ মানুষের আয়ত্ত। বিশ্বের সমগ্র জমি যদি পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করা যায়, চাষীদের হাতে তুলে দেয়া যায় নতুন প্রযুক্তির কলা-কৌশল, উপকরণ আর জমি, পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে ওঠে সম্পদের সুষম বণ্টন—তাহলে অনাহার আর দুর্ভিক্ষ ঠেকানো সম্ভব।

জলবায়ু কি বদলে যাচ্ছে ?

০ ০

সাম্প্রতিককালে আবহাওয়ার আলোচনা খবরের কাগজে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের দেশের দক্ষিণ উপকূলে ১৯৭০ সালে ছোবল হেনেছিল যে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন তার স্মৃতি কারো মন থেকে মুছে যাবার নয়। তারপরও প্রতি বছরই নানা দেশে হানা দিচ্ছে অনেক সাইক্লোন, হারিকেন বা তাইফুন। সত্তরের দশকের শুরুতে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে (ইথিওপিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে) দেখা দিয়েছিল নিদারুণ খরা। সম্প্রতি পর পর কয়েক বছর খরায় ব্যাপক ফসলহানি ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এমনি খরায় ফসল নষ্ট হয়েছে বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালে আর ১৯৭৯ সালে। এছাড়া ১৯৭৪-এ ঘটেছে ব্যাপক বন্যা। ভারতের কোন কোন অংশেও দেখা দিয়েছে খরা আর বন্যার প্রকোপ। ১৯৭৮-৭৯-র শীত হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপে স্মরণকালের প্রচণ্ডতম শীত।

কেউ কেউ বলছেন, আসলে বদলে যাচ্ছে গোটা দুনিয়ার জলবায়ুই। আজকাল যেন আর সময়মত বর্ষা আসে না, এলেও আগের মত বৃষ্টি হয় না, শীতও পড়ে না আগের নিয়মমত। চিরাচরিত ঋতুর আবর্তনে যেন ঘটতে শুরু করেছে খাপ-ছাড়া ছন্দপতন। আর যেহেতু ঋতুর আবর্তনের সাথে বাঁধা আমাদের চাষবাস, জীবনযাত্রা, সমগ্র অর্থনীতি—হয়ত এর ফলে গোটা সমাজের ওপরই পড়বে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু সত্যি কি জলবায়ুতে ঘটছে কোন অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম? আর যদি ঘটেই তাহলে তাতে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে আমাদের জীবনযাত্রার ওপর?

জনপ্রিয় মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন প্রায় 'একশ' বছর আগে লিখেছিলেন : "সবাই শুধু গালগল্প করে আবহাওয়ার কথা নিয়ে ; কিন্তু এর

বিষয়ে করে না তো কেউ কিছুই।" আসলে মার্ক টোয়েন যখন একথা লিখেছিলেন তখন আবহবিজ্ঞানের কেবল জন্ম হচ্ছিল। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোতে আবহ বিভাগ প্রতিষ্ঠা আর আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা শুরু হয় মাত্র গত শতকের ষাটের আর সত্তরের দশকে। নানা দেশের মধ্যে আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর আদান-প্রদানও শুরু হয় এই সময়ে।

গত একশ' বছরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে অন্ততঃ দশ হাজার আবহ স্টেশন দিনরাত নির্দিষ্ট সময় পর পর আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করছে। অসংখ্য সমুদ্রগামী জাহাজ আর আকাশচারী বিমান থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে এমনি খবর। সে সব খবর বেতারযোগে পেঁছুচ্ছে কতগুলো প্রধান আঞ্চলিক আর আন্তর্জাতিক আবহাওয়া কেন্দ্রে। গত ষাটের দশকে চালু হয়েছে পৃথিবীর কক্ষপথে আবহাওয়া সন্ধানী উপগ্রহ ; পৃথিবীর চারপাশে দিনরাত ঘুরপাক খাওয়া এসব আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে নেয়া বিপুল পরিমাণ তথ্য যোগ হচ্ছে তার সঙ্গে। আর এসব লক্ষ কোটি তথ্যরাশিকে বিশ্লেষণ করার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে আশ্চর্য দ্রুত গণনশীল বিশাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। কাজেই আজ মানুষ আবহাওয়ার রহস্য যে পরিমাণে আর যেভাবে বুঝতে পারছে এমন আগে আর কখনো হয়নি।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন ১৮৮০ সালের পর থেকে পৃথিবীর—বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধের—গড় তাপমাত্রা ক্রমে ক্রমে বেড়েছে। এই বাড়া চলেছে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ; কিন্তু তারপর দুনিয়া জোড়া তাপমাত্রা আবার একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। এযাবৎ গড় তাপমাত্রা কমেছে প্রায় আধ ডিগ্রি ফারেনহাইট—পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে এর চেয়ে কিছুটা বেশি। উত্তরাঞ্চলে অনেক দেশে এর ফলে গ্রীষ্মকালীন ফসল উৎপাদনের সময় ইতিমধ্যেই কমে গিয়েছে এক সপ্তাহ থেকে দু'সপ্তাহ। এভাবে যদি তাপমাত্রা কমতে থাকে তাহলে আবার হয়তো সারা পৃথিবীতে নেমে আসবে বরফের যুগ—যেমন এসেছে প্রাচীনকালে পৃথিবীতে বার বার।

কেউ কেউ বলছেন এই কমাটা নিতান্তই সাময়িক। কিছু দিন পরই আবার শুরু হবে তাপমাত্রা বাড়া। আর বেশ কিছুদিন ধরেই চলতে থাকবে তাপমাত্রার এমনি বৃদ্ধি। তারপর এই শতকের শেষে বা আগামী শতকে পৃথিবীর তাপমাত্রা দাঁড়াতে পারে গত হাজার বছরের মধ্যে সবচাইতে বেশি। কি ফল হবে তার? কেন সারা পৃথিবী মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হয়ে যায়,

আবার মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে উষ্ণ ?

আবহাওয়া সত্যি সত্যি বদলে যাচ্ছে কিনা তা বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে আবহাওয়ার প্রধান কতগুলো উপাদানের দিকে। দিনে দিনে আমাদের চারপাশে আবহাওয়ার যে নানা বৈচিত্র্য দেখা দেয়, দেশে দেশে ঘটে আবহাওয়ার নানা বিস্ময়কর তারতম্য—এসবের গোড়ার কারণগুলো বুঝতে হবে।

পৃথিবীর আবহাওয়া প্রধানত নির্ভর করে বায়ুমণ্ডল, ডাঙ্গা আর পানির ওপর সূর্যকিরণের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ওপর। সূর্যকিরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে এসে পড়ছে। সূর্যের তুলনায় পৃথিবী আকারে এত ছোট আর রয়েছে এত দূরে যে, সূর্য অবিরত যে শক্তি চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবী পায় তার মাত্র দু'শ' কোটি ভাগের এক ভাগ। তবু এতেই মাত্র দশ মিনিটে পৃথিবীতে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পৌঁছুচ্ছে মানুষ সব রকম উৎস থেকে সারা বছরেও অত শক্তি ব্যবহার করে না।

সূর্যকিরণ পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় কোটি কোটি ঢেউ-এর আকারে—তার বেশির ভাগই মাপে অতি ছোট। দৃশ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মোটামুটি এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের দেড় ভাগ (বেগুনী) থেকে তিন ভাগ (লাল) পর্যন্ত। দৃশ্য বেগুনীর চেয়ে ছোট মাপের ঢেউও আছে—তাদের বলে অতি বেগুনী—তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমানা এক ইঞ্চির পঁচিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। আবার দৃশ্য লালের চেয়ে কিছু বড় মাপের ঢেউ যেগুলো তাদের বলে লাল উজানি—এদের ঢেউ-এর মাপ হতে পারে এক ইঞ্চির আড়াই ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত।

সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি এসে পৌঁছয় তার সবটা পৃথিবী গ্রহণ করতে পারে না। প্রায় অর্ধেকটাই পৃথিবী ঠিকরে দেয় বরফ থেকে, মেঘ থেকে, হাওয়ার আবরণ থেকে। যে অর্ধেক পৃথিবী শুষে নেয় তাতে পৃথিবীর ওপরকার নানা বস্তুর অণুপরমাণুর আলোড়ন যায় বেড়ে, অর্থাৎ পৃথিবীর গা তেতে ওঠে। আর এই শক্তি শুষে নিয়ে পৃথিবী তার বড় অংশ নিজের গা থেকে ফিরিয়ে দেয় লম্বা মাপের তাপরশ্মির আকারে। এই তাপরশ্মির বেশির ভাগই আবার শুষে নেয় পৃথিবীর কাছাকাছি হাওয়ার

স্তরে মিশে থাকা পানির বাষ্প।

পৃথিবীর ওপর সব অংশে সূর্যের কিরণ সমানভাবে পড়ে না। বিষুব অঞ্চলে বেশির ভাগ সময় কিরণ পড়ে মোটামুটি খাড়াভাবে, মেরু অঞ্চলে পড়ে তেরচা হয়ে। তাই সমান কিরণ বিষুব অঞ্চলে যতটা জায়গা জুড়ে পড়ে, মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গায় ছড়িয়ে। তার ফলে বিষুব অঞ্চলে তাপ জমা হয় বেশি ; এখানকার উষ্ণ হাওয়া তাই হালকা হয়ে ওপর দিকে ওঠে। এই হাওয়া ছোটে মেরু অঞ্চলের দিকে। মেরু অঞ্চলে তাপ পড়ে কম ; তাই এখানকার ঠান্ডা আর ঘন হাওয়া নিচের দিকে নামে আর ফিরে আসে বিষুব অঞ্চলের দিকে। এমনি করে বিষুব অঞ্চল আর মেরু অঞ্চলের মধ্যে তাপের তারতম্যের ফলে সৃষ্টি হয় বায়ুপ্রবাহের। এই বায়ু-প্রবাহের মাধ্যমে পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটে—তাপমাত্রার পার্থক্যের তীব্রতা কমে।

এদিকে আবার সমুদ্রের পানি জমিয়ে রাখে সূর্যের তাপশক্তি আর সমুদ্র-প্রবাহের সাথে সাথে তা বয়ে নেয় এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সমুদ্রের পানি প্রচুর তাপ জমিয়ে রাখতে পারে। যত সৌরশক্তি পৃথিবীতে সঞ্চারিত হয় তার এক-তৃতীয়াংশই সমুদ্র স্রোতের মাধ্যমে ছড়ায় দেশ-দেশান্তরে।

বলা বাহুল্য পৃথিবীর ওপর সব জায়গায় সূর্যের আলো ঠিক একই-ভাবে পড়ে না। তার কারণ পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরছে দিন রাত, কক্ষপথের সমতলের সাথে খাড়াভাবে না থেকে খানিকটা হেলে। তার ফলে ঘটছে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সূর্য কিরণের নানা তারতম্য ; ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশের এলাকায় সৃষ্টি হচ্ছে উচ্চ চাপ আর ৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশের কাছে নিম্ন-চাপের এলাকা ; সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবীর ওপরকার বায়ু-প্রবাহের বিস্তর জটিলতা। আর ঘটছে নানা ঋতুর বৈচিত্র্য।

তার ওপর আছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। ডাঙ্গার চেয়ে সমুদ্রে তাপ জমা হয় বেশি, কিন্তু ডাঙ্গা অল্প তাপেই বেশি গরম হয়ে ওঠে, তাতে ডাঙ্গার ওপরকার হাওয়া সমুদ্রের চেয়ে বেশি হালকা হয়। তাই ঠান্ডা ঘন হাওয়া বয় সমুদ্র থেকে ডাঙ্গার দিক। সমুদ্রের ধারে দিনে রাতেও এমনি হাওয়ার তারতম্য ঘটে। দিনে হাওয়া বয় সমুদ্র থেকে ডাঙ্গার দিকে ; রাতে তার উল্টো।

যখন হাওয়া বয় তখন তার সাথে বয়ে নেয় প্রচুর শক্তি। হাওয়ার চাপের তারতম্য বেশি ঘটলে হাওয়া যখন জোরে বইতে থাকে তখন বোঝা যায়

এই তেজ। কখনো প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে যায় ঘরবাড়ি। সাইক্লোন বা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে হাওয়ার বেগ ওঠে ঘণ্টায় একশ'-দেড়শ' মাইল ; ডাঙগায় টর-নাডো বা তীব্রঘূর্ণি বইলে তার ভেতর কখনো কখনো হাওয়ার বেগ উঠতে পরে ঘণ্টায় চার-পাঁচশ' মাইল পর্যন্ত।

হাওয়ার চাপের তারতম্য আবার জলীয় বাষ্পের ওপরও অনেকটা নির্ভর করে। হাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণে যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। মরুভূমির ওপর দিয়ে ছোটা হাওয়ায় জলীয় বাষ্প হতে পারে শূন্য ; আবার সমুদ্রের ওপর থেকে আসা হাওয়ায় হতে পারে শতকরা চার ভাগ পর্যন্ত। হাওয়ায় জলীয় বাষ্প বাড়লে সে হাওয়ার চাপ কমে।

হাওয়ায় জলীয় বাষ্পও বয়ে নেয় প্রচুর শক্তি। পানি বাষ্প হবার সময় সে পানি অনেকখানি তাপ শুষে নেয়। এই ভেজা হাওয়া ওপর দিকে উঠে ঠাণ্ডা হলে বাষ্প জমে গিয়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম পানির (বা বরফের) কণায় পরিণত হয়, আর বাষ্পে জমে থাকা তাপ তখন ছাড়া পায়।

হাওয়ায় যে কি পরিমাণ পানি ভেসে বেড়াচ্ছে তা চট করে বোঝা শক্ত। প্রতি বছর পৃথিবী থেকে প্রায় এক লক্ষ ঘন মাইল পানি বাষ্প হয়ে উঠছে হাওয়ায়। আর ওপর দিকে ওঠা এই বাষ্পের কিছু ঠাণ্ডায় জমে অতি সূক্ষ্ম পানির কণা হয়ে ভাসছে মেঘের আকারে। শরতের একটি হালকা সাদা মেঘে ভেসে বেড়াতে পারে কয়েকশ' থেকে কয়েক হাজার টন পানি। আর একটা ঝড়ো মেঘে পানি জড়ো হয় কয়েক লক্ষ টন। বলা বাহুল্য, যেমন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর বুক থেকে বাষ্প হয়ে ভেসে উঠছে পানি তেমনি প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে হাজার হাজার জায়গায় ঝরছে ঝর ঝর বৃষ্টি, ভরে দিচ্ছে নদী-নালা, খাল-বিল। আর প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ পানি ভেসে উঠছে শূন্যে, আবার প্রায় সেই পরিমাণ পানিই হয়তো অন্য কোথাও ঝরে পড়ছে বৃষ্টি হয়ে। এর ফলে মোটামুটিভাবে সারা পৃথিবীতে জল-চক্রের ভারসাম্য বজায় থাকছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সার্বিক আবহাওয়ার একটা বড় নিয়ামক হল কি পরিমাণ শক্তি সূর্য থেকে এসে পড়ছে পৃথিবীতে, তার কত অংশ পৃথিবী ঠিকরে ফিরিয়ে দিচ্ছে শূন্যে আর কত অংশ শুষে নিচ্ছে নিজের বুকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই শক্তি শোষার তারতম্যের ফলে ঘটছে হাওয়ার চলাচল, আবহাওয়ার নানা বৈচিত্র্য। আর এই শক্তির ভারসাম্যে যেমন প্রভাব ফেলছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, তেমনি সমুদ্রের পানি আর স্রোত, আর ডাঙগার নানা বৈশিষ্ট্য।

বহু ধরনের প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে সূর্যরশ্মি এসে পৌঁছবার পরিমাণে কম-বেশি হতে পারে। ১৬১১ সালে গালিলিও গালিলাই তাঁর দূরবীন দিয়ে সূর্যের গায়ে কলঙ্কের নড়াচড়া দেখে প্রথম বুঝতে পারেন যে, সূর্য তার অক্ষের চারপাশে ঘুরছে ; এসব সৌরকলঙ্ক বিভিন্ন সময়ে আকারে আর সংখ্যায় কমে-বাড়ে। মোটামুটি এগার বছর পর পর দেখা দেয় সূর্যকলঙ্কের এমনি প্রাবল্য। সৌরকলঙ্কের তারতম্যের সাথে পৃথিবীর ওপর সূর্য কিরণের পরিমাণ আর প্রকৃতিরও তারতম্য ঘটে। তা ছাড়া এই শতকের শুরুতে মিলান্‌কোভিচ নামে এক যুগোশ্লাভ জ্যোতির্বিদ হিসেব করে দেখান যে, সূর্যের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর অক্ষ লাট্টুর মত ক্রমাগত হেলতে থাকে। এতেও পৃথিবীতে সূর্যের আলোকপাতের তারতম্য ঘটে ; আর এই আবর্তনের চক্র চলে প্রায় এক লাখ বছর ধরে।

কোন বড় রকম আগ্নেয়গিরির উদ্গার ঘটলে আকাশের উঁচু স্তরে ছড়িয়ে পড়ে কোটি কোটি টন ধুলো আর ধোঁয়ার কণা ; তার ফলে পৃথিবীতে সূর্যরশ্মি পৌঁছনো কমে যায়। পৃথিবীর তাপমাত্রাও কমে। এমনি ঘটেছিল ১৮১৫ সালে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে টাম্বোরা আগ্নেয়-গিরি আর ১৮৮৩ সালে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড বিস্ফোরণে।

আজ বিজ্ঞানীরা জেনেছেন গত একশ' কোটি বছর ধরে পৃথিবীর আব-হাওয়ার অনেক ওঠানামা ঘটেছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময়ে গড় তাপমাত্রা থেকেছে ৭২ ডিগ্রি ফা. (২২ ডিগ্রি সে.)-এর কাছাকাছি। কিন্তু মোটামুটি পঁচিশ কোটি বছর পর পর চারবার পৃথিবীর তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে—পৃথিবীর বিশাল এলাকা ঢেকে গিয়েছে বরফের স্তূপে। এসব তীব্র শীতের সময়কে বলা হয় 'বরফের যুগ'। আদতে আজও আমরা বাস করছি এমনি চতুর্থ বরফের যুগের শেষ প্রান্তে। আজ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৫৮ ডিগ্রি ফা. (১৪ ডিগ্রি সে.)। উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর কাছে সারা বছর ঢাকা রয়েছে বরফের স্তূপে। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে এসব অঞ্চল বেশির ভাগ সময় থেকেছে বরফমুক্ত।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে শুরু হয় শেষ শীতের প্রকোপ। মোটামুটি ২০ লক্ষ বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষরা দেখা দেয় পৃথিবীতে। এরপর থেকে লাখ খানেক বছর পর পর একবার করে এই বরফ কিছুটা গলেছে (একেকবার বরফ গলার সময় থেকেছে প্রায় দশ হাজার বছর)

কিন্তু পৃথিবীতে বরফ জমা একেবারে শেষ হয়নি।

মাত্র পনের বিশ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপের প্রায় অর্ধেক এলাকা ঢাকা ছিল মাইলখানেক পুরু বরফের স্তূপে। এই বরফের স্তূপ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে সরেছে মাত্র আট হাজার বছর হল, উত্তর কানাডা থেকে মাত্র ছ' হাজার বছর আগে। এসব এলাকার জমি এই পুরু বরফের চাপ থেকে ছাড়া পেয়ে এখনও উঁচু হয়ে উঠছে বছরে প্রায় আধ ইঞ্চি।

এমনি পঁচিশ কোটি বছর পর পর কেন এসেছে এমন বড় রকম বরফের যুগ, তারপর গত পাঁচ কোটি বছরে আসছে লাখখানেক বছর পর পর-তার সব ব্যাখ্যা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তবে এটা স্পষ্ট যে সর্বশেষ বরফের স্তূপ গলে যাবার পর পরই গত দশ হাজার বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে মানুষের আজকের সভ্যতা। অবশ্য এই দশ হাজার বছরেও তাপমাত্রার ওঠা-নামা ঘটেছে অনেক। আর মনে হয় আবহাওয়া যখন কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠেছে তখনই যেন সভ্যতার বিকাশ দ্রুততর হয়েছে।

মোটামুটি দু' হাজার থেকে আট হাজার বছর আগে উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা ছিল আজকের চেয়ে দু'-এক ডিগ্রি বেশি। এমনি উষ্ণতা হাওয়ায় অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প সঞ্চারের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটায় বেশি ; তাতে চাষবাসের সুবিধে। আর এই উষ্ণ সময়ে নীল উপত্যকা থেকে পারস্য উপসাগর, ভারতীয় উপমহাদেশ আর চীনের উর্বর এলাকায় মানুষ চাষবাস শিখেছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে, লিপি আবিষ্কার করেছে ; শিখেছে নৌপথে দূরদেশে যেতে, জীবজন্তুকে পোষ মানাতে। মিশরীয়, সুমেরীয়, ভারতীয়, চীনা সভ্যতার বিকাশ এই সময়ে।

তিন হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি থেকে হাজার খানেক বছর ধরে এসব এলাকার অনেক জায়গার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আর শুকনো হয়ে ওঠে। এমন ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাতাসে জলীয় বাষ্প কমে আসে, বৃষ্টিপাতও কমে যায়। ঘটে খরার প্রকোপ, মরু এলাকার বিস্তার। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় সাহারা আর আরবের সবুজ এলাকা পরিণত হয় উষ্ণ মরুভূমিতে। খরায় ধ্বংস হয়ে যায় সিন্ধু সভ্যতা। দু' হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি আবার এই রুক্ষ খরার প্রকোপ কমে আসে। কিন্তু তারপরও আবহাওয়ার ওঠা-নামা অব্যাহত থেকেছে। কখনো এসেছে অনাবৃষ্টি, কখনো শীতে জমে গিয়েছে নদীনালা, কখনো এসেছে দুর্ভিক্ষ ; আবার কখনো দেখা দিয়েছে মনোরম আবহাওয়া, যথেষ্ট বৃষ্টি, ফসলের

প্রাচুর্য।

চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই প্রায় পাঁচ শ' বছর ধরে উত্তর গোলার্ধে দেখা দেয় এক ক্ষুদে বরফের যুগ। তাপমাত্রা কিছুটা কমে আসে। নদীনালা প্রায়ই বরফে জমে যায়, খরা দেখা দিতে থাকে মাঝে মাঝে। এই সময়েই ইউরোপের শীতল এলাকার লোকেরা বেরিয়ে পড়ে উষ্ণ দেশের সন্ধানে ; ক্রমে ক্রমে তারা নানা দেশে গড়ে তোলে উপনিবেশ। আমেরিকা, এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন হয় এই সময়ে। আর উপনিবেশ লুণ্ঠনের বিপুল সম্পদের ভিত্তিতে ইউরোপে দেখা দেয় শিল্প-বিপ্লব।

শিল্প-বিপ্লবের একটি ফল দাঁড়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের আধিপত্যের বিস্তার। অসংখ্য নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠে, জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, বাড়ে জনপদের পরিমাণ। পৃথিবীর অনেক বেশি এলাকার ওপর মানুষের সভ্যতার ছাপ পড়ে। তার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম আবহাওয়া পরিবর্তনে মানুষের অস্তিত্ব একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

জনসংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে কলকারখানা ; এসব কলকারখানা আর মানুষ পৃথিবীর হাওয়ায় ধোঁয়া আর ধুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে অনবরত। আগের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম চাষের মত বহু দেশে বনজঙ্গল, তৃণভূমি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে সাবাড় করে সেখানে চাষবাস করছে মানুষ। মোটর গাড়ি, এরোপ্লেনের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে চারপাশে ; ধোঁয়া ছড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ কারখানার চিমনি। যত বেশি এলাকা চাষের নীচে আসছে তত বেশি ধুলো উড়ছে আকাশে। এ সবের অনেক কিছু উঠছে গিয়ে উঁচু সূক্ষ্মমণ্ডলে আর এই ভাসমান ধুলোর আবরণ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীতে সূর্যের রশ্মি পৌঁছবার পথে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন পৃথিবীতে সূর্যের তাপ পৌঁছনো যদি স্থায়ীভাবে শতকরা মাত্র দেড় কি দু'ভাগ কমে যায় তাহলেও ক্রমে ক্রমে উত্তরের বরফের এলাকা ছড়িয়ে পড়বে বিষুব রেখা পর্যন্ত ; শেষটায় জমে যাবে সব সাগর আর মহাসাগর।

আজ পৃথিবীর ডাঙ্গার ওপরকার শতকরা দশ ভাগের মত জায়গা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। এই বরফের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ ঘন মাইল—

অবশ্য এর বেশির ভাগই রয়েছে দক্ষিণ মেরুতে আর গ্রীনল্যাণ্ডে। কিন্তু শেষ বরফের যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে পনের-বিশ হাজর বছর আগে, এর চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি জায়গা ঢাকা ছিল বরফের স্তূপে। প্রায় সারাটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ছিল বরফের তলায়। তেমনি বরফের যুগ কি আবার আসবে?

কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, শিগগির এরকম ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। বরফের যুগ এলেও তা আসতে লেগে যেতে পারে হাজার পঞ্চাশেক বছর। বরং ধুলোর কণা উঁচু আকাশে না জমে যদি জমে পৃথিবীর কাছাকাছি তাহলে তা বায়ুমণ্ডলে বেশি তাপ আটকে রাখবে।

পৃথিবীতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ আর কলকারখানা বাড়বার ফলে আজ পোড়ানো হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি। তাতে প্রচুর তাপ ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর হাওয়ায়। তাছাড়া কয়লা, তেল এসব জ্বালানি পোড়াবার ফলে বায়ুমণ্ডলে বাড়ছে কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ। এমনিতে হাওয়ায় এই বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাসটির পরিমাণ অতি সামান্য। প্রতি দশ হাজার ভাগে তিন ভাগের মত। জীবজন্তুর নিঃশ্বাস থেকে বিপাক ক্রিয়া-ফল হিসেবে বেরোয় এই গ্যাসটি; অঙ্গারঘটিত কোন বস্তুর দহন ঘটলেও সৃষ্টি হয় এর। আবার গাছপালা সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদনে হাওয়া থেকে শুষে নেয় এই গ্যাসটি। তেমনি খানিকটা মিশে যায় সমুদ্রের পানিতে—সেখানে তাকে শুষে নেয় সামুদ্রিক উদ্ভিদরা। দুনিয়াতে মানুষের বসত বাড়ার সাথে সাথে কমছে বনভূমি। সমুদ্রেও অজস্র জাহাজ আর কলকারখানা থেকে নিঃসৃত তেলাক্ত দূষণের ফলে কমে যাচ্ছে উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন। এসব কারণে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দহন আর মানুষের নিঃশ্বাসের ফলে হাওয়ায় কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

কারবন ডাই-অক্সাইডের একটি গুণ এই যে, এর ভেতর দিয়ে অনায়াসে ছোট মাপের সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে এসে পেঁছয়। কিন্তু পৃথিবী থেকে বড় মাপের যে তাপ তরঙ্গ বিকিরিত হয় তা এর জালে আটকা পড়ে; পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন ১৮৫০ সালের পর থেকে ইতিমধ্যেই হাওয়ায় কারবন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা অন্ততঃ দশ ভাগ; আর এই শতকের শেষে এই গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে পারে আরো শতকরা বিশ ভাগ। এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে

আধ ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

কারবন ডাই-অক্‌সাইডের পরিমাণ একুশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরেই বেড়ে যেতে পারে আরো শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ; আর তাতে হাওয়ার গড় তাপমাত্রা বাড়তে পারে আরো এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। তাহলে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি আবহাওয়ায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটবে। উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা আজকের চেয়ে দু'ডিগ্রি সে. বাড়লে উত্তর সাগরের বরফ সম্পূর্ণ গলে যেতে পারে। শুধু যে গ্রীষ্মকালেই উত্তর সাগর বরফমুক্ত হবে তা নয়, শীতকালেও উত্তর সাগরের অনেক এলাকায় বরফ জমবে না। এ অবস্থায় বরফের স্তূপ টিকে থাকবে শুধু দক্ষিণ মেরুতে আর গ্রীনল্যাণ্ডে।

তাপমাত্রা বাড়ার একটা ফল হবে এই যে, সাগর থেকে পানি বাষ্প হবার পরিমাণ বাড়বে; আর তাতে বাড়বে পৃথিবীতে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণও। অবশ্য বৃষ্টিপাত যে পৃথিবীর সব এলাকায় একইভাবে বাড়বে তা নয়, বরং বিষুব অঞ্চল আর মেরু অঞ্চলের মাঝামাঝি কোন কোন এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাবারই সম্ভাবনা। খুব সম্ভব আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে, ভারতীয় উপদ্বীপ আর মধ্যপ্রাচ্যের বহু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বাড়বে, আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ, কানাডা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে।

তাপমাত্রা বাড়ার প্রভাবটা বেশি দেখা দেবে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি, কাজেই বিষুব অঞ্চল আর মেরু অঞ্চলের মধ্যে তাপের তারতম্য আজকের তুলনায় কমে আসবে। এর ফলে এই দুই এলাকার মধ্যে সাধারণ বায়ু-প্রবাহের তীব্রতাও কম হবে; হাওয়ার বেগ কম হওয়ায় সাগর থেকে মহাদেশের ওপর বাষ্প বয়ে নেওয়া যাবে কমে। কাজেই বৃষ্টিপাত সাগরের ওপর হবে বেশি; ডাঙায় অনেক জায়গাতেই বৃষ্টিপাত কমে যাবে। নানা দেশে মানুষের জীবনযাত্রায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হবে সেখানে দেখা দেবে খরা আর অনাবৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুর এলাকা সরে যাবে উত্তর দিকে; চাষবাস আর মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে ঘটবে পরিবর্তন।

অবশ্য তাপমাত্রা বাড়ার ভাল দিকও রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় সচরাচর আবহাওয়ার উষ্ণতার সাথে যোগ রয়েছে মানুষের সভ্যতার বিস্তারের। ১৮৮০ সালের পর থেকে একশ' বছরের তাপমাত্রা গত প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলা চলে। আর

এই সময়েই অধিকাংশ শিল্প আর উৎপাদনের ঘটেছে বিপুল অগ্রগতি। কানাডায় চাষের এলাকা উত্তর দিকে এগিয়েছে প্রায় একশ' মাইল।

এসব পরিবর্তন যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে তাহলে মানুষ সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তার জীবনযাত্রা আর উৎপাদন পদ্ধতির ধারাকে। কিন্তু তা না হয়ে পরিবর্তন যদি আসে আকস্মিক বা দ্রুতগতিতে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তাহলে ওলট-পালট ঘটবে জীবন-যাত্রায়। কোথাও ঘটবে উৎপাদনের বিকাশ, কোথাও ঘটবে বিপর্যয়।

বলা বাহুল্য, এ সবই এখনও বিজ্ঞানীরা শুধু সম্ভাবনার সীমার মধ্যে বিবেচনা করছেন। সূর্য দিন-রাত যে বিকিরণ ছড়িয়ে যাচ্ছে তার পরিমাণ কি স্থির থাকছে, না বদলাচ্ছে? বদলালে কি কি কারণে কতখানি বদলাচ্ছে? পৃথিবীর ওপরকার সূক্ষ্মমন্ডলে ওযোন স্তর ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি শুষে নেয়; সেই স্তরে কি কোন পরিবর্তন ঘটছে? এমনি বহু বিষয় নিয়ে আজো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আবহবিজ্ঞানীরা নিরন্তর তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। মহাকাশ যান থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশের আর সূর্য সম্পর্কে তথ্য। পরিমাপ সংগ্রহ করা হচ্ছে সাগরের তলা থেকে, সারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে।

এসব তথ্য সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য একটিই। সে হল ভবিষ্যতের পরি-বর্তনের ধারা সম্পর্কে আরো নিশ্চিত পূর্বাভাস দিতে পারা; আর পরিবর্তনের জন্যে মানুষকে আরো ভাল করে তৈরি করা। সেই প্রাচীন কালের ডাইনোসর প্রভৃতি বিরাটকায় প্রাণী আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে দুনিয়া থেকে লোপ পেয়েছিল। কিন্তু ডাইনোসর-দের সাথে বুদ্ধিমান মানুষের তফাৎ অনেক। মানুষ তার জ্ঞানের আলোকে আগামী দিনের পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অনেক কথা আগে থেকেই জানতে পারে; আর তার বুদ্ধি আর প্রযুক্তির কৌশলে পরিবেশকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নানা ধরনের অবস্থায়।

মার্ক টোয়েনের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলতে হয়ঃ যদি পৃথিবীর আবহাওয়ায় আসে বড় রকম পরিবর্তন, তাহলে তার সম্বন্ধে শুধু আলো-চনা না করে মানুষ কি সত্যি সত্যি তৈরি থাকতে পারবে তার জন্যে? আর কাজে লাগাতে পারবে কি এসব পরিবর্তনকে সারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণে?

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ কতদূর

০০ ০

বাংলাদেশকে বলা হয় ষড়ঋতুর দেশ। পশ্চিমের দেশগুলোতে সচরাচর শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ এই চারটি ঋতু ধরা হয়ে থাকে। এদেশে তার ওপর বর্ষা আর হেমন্ত ঋতু যোগ হওয়াটা এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেরই পরিচয় দিচ্ছে।

মূলত কৃষিজীবী এদেশের মানুষের জীবন যেন ঋতুবদলের সাথে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। প্রচন্ড গ্রীষ্মের রোদে চাষী জমি তৈরি করে অপেক্ষা করে বৃষ্টির রসধারার জন্যে। সেই রসসিক্ত মাটিতে বোনা হয় বীজ। বৃষ্টি আর রোদের মিলিত ঐশ্বর্যে ক্রমে ক্রমে পেকে ওঠে সোনালী ধান। কিন্তু যদি সময়মতো না আসে প্রত্যাশিত বর্ষণ তাহলে কুঁকড়ে কালো হয়ে যায় ফসলের চারা। দেশময় ধ্বনিত হতে থাকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। আবার কখনো অতিবৃষ্টিতে দেখা দেয় প্লাবন। তাতেও নষ্ট হয় ফসল, ভেসে যায় ঘরবাড়ি।

কৃষির সাথে আবহাওয়ার এ নিকট-সম্পর্ক শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা দুনিয়া জুড়েই। আর আদতে দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের বসত গড়া আর জীবনযাত্রার ওপর আবহাওয়ার প্রভাব অনেকখানি।

ঠান্ডা-গরম, রোদ-বৃষ্টি, হিমেল তুষারপাত আর তাতানো লু হাওয়ার ঝাপটা, মৃদুমন্দ মলয় অথবা প্রবল ঝড়ের ঝঞ্ঝনা—এসবই আবহাওয়ার নানা উপাদান। আবহাওয়ার উপাদান যেখানে মানুষের অনুকূল সেখানেই সচরাচর বসত পেতেছে মানুষ, আবার কোথাও কোথাও তাকে আবহাওয়ার সাথে আপসও করতে হয়েছে।

শুধু মনোরম আবহাওয়াই তো মানুষের জীবনযাত্রার জন্যে যথেষ্ট নয়। চাষবাসের জন্যে চাই ভাল জমি, যথেষ্ট পানি ; উৎপাদনের জন্যে দরকার জ্বালানি, নানা খনিজ বস্তু। হয়তো কোথাও রুক্ষ মরুভূমির নীচে রয়েছে

প্রচুর খনিজ সম্পদ। আবার কোথাও দিগন্তবিস্তৃত উর্বর জমি শীতকালে ঢেকে যায় পুরু তুষারের স্তূপে। এমনি নানা দেশে বসত গেড়েছে মানুষ। নানা অঞ্চলে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিচিত্র পোশাক, বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি, চাষবাসের নানা পদ্ধতি, জীবনযাপনের বিচিত্র ধারা, নানা লোকাচার।

কিন্তু মানুষ কি চিরকাল পরিবেশের সাথে এমনি আপস করেই যাবে? মানুষের দরকার মতো আবহাওয়াকে কি বদলানো যায় না ?

ছোটখাট আকারে চারপাশের আবহাওয়াকে বদলাবার চেষ্টা করছে মানুষ গোড়া থেকেই। ঝাঁঝালো রোদের তাত থেকে বাঁচার জন্যে চাষী পরে মাথাল অথবা আশ্রয় নেয় বৃক্ষের শীতল ছায়ায়। বৃষ্টির সময়ে মানুষ মাথায় ধরে ছাতা, শীতে আগুন জেবলে তাতায় শরীর বা গায়ে জড়ায় গরম চাদর। এ-সবই ছোট এলাকায় আবহাওয়া বদলাবার আয়োজন।

আরো ব্যাপক আকারে আবহাওয়া বদলাবার চেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় অথবা মানুষের নিজের তৈরি বাসগৃহ। কৃষকের পর্ণকুটিরের চেয়ে শহরের বিলাসপূর্ণ প্রাসাদে স্বভাবতই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের আয়োজন ব্যাপকতর। উত্তরের হিমেল হাওয়া বা ঝড়ো বৃষ্টির ছাঁট পর্ণকুটিরে ঢোকার সুযোগ পায় সহজেই, কিন্তু সুরক্ষিত বড় দালানে তার প্রবেশাধিকার নেই। বাইরে কাঠফাটা রোদ যত কড়াই হোক, প্রাসাদের কন্দরে শীতল ছায়া, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তাপমাত্রা, হাওয়ার প্রবাহ আর আর্দ্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট করে বাইরের আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিমন্ডলের সৃষ্টি করতে পারে। এমনি ভিন্ন পরিমন্ডলের ব্যবস্থা সম্ভব শুধু অফিসে বা বাড়িতে নয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কারখানা, রেল, জাহাজ, বিমান বা মোটর গাড়িতেও।

দূরপাল্লার বিমানে শুধু যে তাপমাত্রা, হাওয়ার প্রবাহ আর আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত হয় তাই নয়, সেখানে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় হাওয়ার চাপও। এসব বিমান যে পরিমাণ উঁচু দিয়ে ওড়ে সেখানে বিমানের বাইরে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির বহু নিচে আর বায়ুচাপ স্বাভাবিক হাওয়ার তুলনায় বহু গুণে কম। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাই বিমানের ভেতর সৃষ্টি করতে হয় কৃত্রিম আবহাওয়া। এমনি বিশেষ আবহাওয়ার পরিমন্ডল প্রয়োজন গভীর সাগরের তলায় অভিযাত্রী ডুবুরী বা নভোচারীদের জন্যেও।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টান্ত কম নয়। শীতের দেশে শাক-সবজি ফলমূল উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করা হয় উষ্ণ 'কাচঘর' (গ্রীন-হাউস)। কাচের ছাদ আর দেয়াল ভেদ করে ছোট মাপের আলোক তরঙ্গ নিয়ে সূর্যকিরণ ঢোকে এমনি কাচঘরে, কিন্তু সেখান থেকে বড় মাপের তাপতরঙ্গ আর কাচ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না ; কাজেই বাইরে প্রচুর ঠান্ডা হলেও গরম থাকে ভেতরের হাওয়া। আমাদের দেশে কোল্ড-স্টোরেজে সারা বছর জমিয়ে রাখা হয় আলু এবং অন্যান্য ফলমূল। বিদেশে অপারেশন থিয়েটারে, ঘড়ি, সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা ওষুধ তৈরির কারখানায় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও বজায় রাখতে হয় ধূলিকণা ও জীবাণুমুক্ত আবহাওয়া।

কিন্তু এসব তো ছোট আর আবদ্ধ এলাকায় আবহাওয়া বদলানো। মানুষ কি পারবে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে বড় এলাকা জুড়ে আবহাওয়া বদলাতে ?

মানুষের ক্রিয়াকর্মের ফলে খোলা জায়গায় কিছুটা বড় আকারে আবহাওয়া বদলাচ্ছে আপনা থেকেই। বড় শহরের উঁচু দালানকোঠা হাওয়ার স্বাভাবিক গতি বদলে দেয়, ইট পাথর গরম হয়ে চারপাশকে তাতিয়ে তোলে ; শিল্পশহর কারখানার চিমনি থেকে আকাশে ছড়ায় বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া আর ধূলিকণা। তাই বড় শহরে হাওয়া বয় আশেপাশের গ্রামের তুলনায় অন্তত শতকরা দশ-পনের ভাগ কম ; শীতকালে তাপমাত্রা হতে পারে আশেপাশের গ্রামের চেয়ে দু'তিন ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি। বড় শিল্প শহরে বৃষ্টিপাতও হয় শতকরা দশ ভাগের মতো বেশি।

মানুষের তৈরি কলকারখানার চিমনি থেকে প্রতি বছর হাওয়ায় মিশছে অন্তত দেড় হাজার কোটি টন কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। কলকারখানা যেমন বাড়ছে তেমনি কমে যাচ্ছে কারবন ডাই-অক্সাইড শুষে নেবার মতো বন-জঙ্গলের এলাকা। কাজেই পৃথিবীর হাওয়ায় বেড়ে চলেছে এই গ্যাসের পরিমাণ। কারবন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে তাপ আটকে রাখে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা আর পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপর তার প্রভাব।

কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডে আপনা-আপনি আবহাওয়া বদলে যাওয়া এক কথা, আর মানুষের দরকারমতো আর ইচ্ছে অনুযায়ী আবহাওয়া বদলাতে পারা অন্য কথা। আবহাওয়ার করুণার ওপর নির্ভর করে থাকতে মানুষ আর রাজি নয়। আবহবিজ্ঞানীদের আজ লক্ষ্য ঃ আবহাওয়াকে বদলে মানুষের আরাম-আয়েস বাড়ানো, আবহাওয়ার উপাদানকে মানুষের প্রয়োজন-

মতো উৎপাদনের কাজে লাগানো আর উন্মত্ত প্রকৃতির ধ্বংসলীলা থেকে মানুষের সৃষ্টিকে বাঁচানো।

আবহাওয়া নিয়ে মানুষ বহু হাজার বছর ধরে চিন্তাভাবনা করলেও বিজ্ঞান হিসেবে আবহবিদ্যার চর্চা মাত্র গত শ'দেড়েক বছর হল। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের প্রবর্তনের ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে আবহাওয়ার খবরাখবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। প্রথম প্রথম বেলুনে করে উঁচু বায়ুমণ্ডলের খবর সংগ্রহ করতে হত ; বিশ শতকে তার সাথে যোগ হয়েছে বেতার ব্যবস্থা, রকেট, রেডার এবং অতি সম্প্রতি কৃত্রিম উপগ্রহ। আবহাওয়ার অসংখ্য তথ্য দ্রুত সংকলন আর বিশ্লেষণের জন্যে তার সাথে যোগ হয়েছে কম্পিউটর বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রগণক। নানা আন্ত-র্জাতিক উদ্যোগের ফলে আবহাওয়ার নানা অজানা রহস্য মানুষের আয়ত্ত ; আর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের পথেও বহুদূর এগিয়েছে মানুষ।

এর মধ্যেই মানুষ সফল হয়েছে মেঘ থেকে ইচ্ছেমতো বৃষ্টি নামাতে, দরকারমতো বৃষ্টি ঠেকাতে আর শিলাবৃষ্টি দমন করতে। এবার চেষ্টা চলেছে বড় আকারের ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনকে কাবু করার আর তার ধ্বংস-লীলা থেকে মানুষকে রক্ষা করার।

অবশ্য দরকারমতো বৃষ্টি নামাবার আর শিলাবৃষ্টি ঠেকাবার চেষ্টা করছে মানুষ সেই আদিকাল থেকে। প্রাচীনকালের লোকেরা ভাবত ঝড়-বৃষ্টি শিলা-বজ্র এসব বুঝি দুষ্টু অপদেবতাদের কাণ্ড। তাই প্রাচীন ইউ-রোপে মন্ত্রপূত তীর ছুঁড়ে এসব অপদেবতাকে কাবু করার চেষ্টা করা হত। আমাদের দেশে এককালে শিলারি নামে এক দল লোক জাদুমন্ত্রের সাহায্যে শিল তাড়াবার আয়োজন করত। গ্রামের লোকে তাদের চাঁদা করে পুষত নিজেদের ফসলের খেত শিলাবৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে। অনেক সময় খরা বা অনাবৃষ্টি হলে ব্যাঙের বিয়ে বা অন্যান্য নানা লোকাচারের সাহায্যে বৃষ্টি নামাবার চেষ্টা করা হত। এসব লোকাচারের রেশ এখনও আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে চীন দেশে হাউই আর আতশবাজি ছুঁড়ে মেঘ থেকে শিল ঝরা ঠেকাবার চেষ্টা করা হত। আজ সেখানে ছোঁড়া হচ্ছে রকেট আর সে রকেটে পুরে দেয়া হচ্ছে রাসায়নিক উপাদান। রাসায়নিক উপাদান দিয়ে বৃষ্টি নামানো আর শিল ঠেকানোর ব্যবস্থা আজ বহু দেশে চালু হয়েছে।

রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা প্রথম শুরু হয় এই শতকের চল্লিশের দশকে। এই সময়ে আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটেছিল।

আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর এক তরুণ বিজ্ঞানী ভিনসেণ্ট শেফার (Vincent J. Shaefer) ১৯৪৬ সালে একদিন নিচু হয়ে তাঁর ঘরের গভীর হিমায়ক (ডীপ ফ্রীজ) থেকে কিছু খাবার বের করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নাক-মুখের হাওয়া বেরিয়ে ডীপ ফ্রীজের ভেতর মেঘের মতো সৃষ্টি হল। শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডায় নাক-মুখের হাওয়া বেরিয়ে এমনি কুয়াশা বা মেঘ তৈরি হতে আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু শেফারের মাথায় একটা অদ্ভুত বুদ্ধি খেলল। তিনি এক চিম্‌টে কারবন ডাই-অক্সাইড (চলতি কথায় একে বলা হয় ড্রাই-আইস্ বা 'শুকনো বরফ') এনে ছুঁড়ে দিলেন ঐ মেঘের দিকে। দেখতে দেখতে সেই মেঘের বাষ্প ঠাণ্ডায় আরো জমে গিয়ে ডীপ ফ্রীজের ভেতর তুষারপাত হতে আরম্ভ করল।

শেফার তাঁর আরেক সহকর্মী আরভিং ল্যাংম্যুর (Irving Langmuir) -এর সাথে এ বিষয়ে আরো বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। সচরাচর পানির হিমাঙ্ক শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। কিন্তু মেঘের জলকণা এই তাপমাত্রার বেশ কিছু নীচেও জমে বরফ হয় না ; এ অবস্থায় তাকে বলা যায় অতি-শীতল জলকণা। দেখা গেল ভাসমান অতিশীতল জলকণার তাপমাত্রা যদি নেমে যায় সেণ্টিগ্রেড মাপে শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রির কাছাকাছি তাহলে সে কণা যত ছোটই হোক তা আপনা থেকে বরফ-কণায় পরিণত হয়। কিছু কিছু রাসায়নিক উপাদান অতিশীতল বাষ্পের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে বরফের কেলাস জমে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ তাপমাত্রা অতটা কম না হলেও চলে। জমাট কারবন ডাই-অক্সাইড হল এমনি এক উপাদান।

গবেষণাগারে পরীক্ষা সফল হবার পর শেফার আর ল্যাংম্যুর উড়ো-জাহাজ নিয়ে উঠলেন আকাশের ওপরে। একটি অতিশীতল স্তরমেঘের ওপর ছুঁড়ে দেয়া হল কিছু জমাট কারবন ডাই-অক্সাইডের গুঁড়ো। পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে সেখানকার মেঘের ধরন বদলে যেতে লাগল ; মেঘ থেকে পানির কণা জমে গিয়ে ঝরতে লাগল তুষারকণা। বার বার এই পরীক্ষা করে একই রকম ফল পাওয়া গেল।

বার্নার্ড ফনেগুট (Bernard Vonnegut) নামে একজন বিজ্ঞানী বললেন বরফের কেলাসের আকার হল ছ'মুখো ; এমনি ছ'মুখো আকার সিলভার আয়োডাইড কেলাসেরও (সিলভার আয়োডাইড ফটোগ্রাফীতে ব্যব-

হার করা হয়)—কাজেই মেঘের জলকণা জমিয়ে বরফকণা সৃষ্টির জন্যে সিলভার আয়োডাইড উপযোগী হবার কথা। উত্তাপ দিয়ে তিনি সিলভার আয়োডাইডকে অতি সূক্ষ্ম ধোঁয়ায় পরিণত করলেন ; তারপর জমাট কারবন ডাই-অক্সাইডের গুঁড়োর বদলে এই ধোঁয়াকে ছড়িয়ে দেয়া হল অতিশীতল মেঘের ওপর। আর সত্যি সত্যি এই ধোঁয়ার কণার গায়ে গায়ে দ্রুত জমতে লাগল বরফকুচি। দেখা গেল জমাট কারবন ডাই-অক্সাইডের জন্যে মেঘের তাপমাত্রা —১০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড হওয়া দরকার ; কিন্তু সিলভার আয়োডাইড ধোঁয়ার জন্যে মেঘের তাপমাত্রা —৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড হলেই চলে।

জমাট কারবন ডাই-অক্সাইডের চাইতে সিলভার আয়োডাইড বয়ে বেড়ানো সহজ, ছিটিয়ে দেয়াও সুবিধেজনক। এর ধোঁয়া উড়োজাহাজ থেকে মেঘের ওপর ছড়িয়ে দেয়া যায়, আবার মাটি থেকেও মেঘের দিকে উড়িয়ে দেয়া যায়—অবশ্য এতে বেশ কিছু ধোঁয়া নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

এরপর এমনি আরেক ছ'মুখো কেলাসের হদিস পাওয়া গেল ; সে হল লেড আয়োডাইড। এও মোটামুটি —৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় মেঘকে বরফ-কুচিতে পরিণত করতে পারে ; অথচ সিলভার আয়োডাইড-এর তুলনায় লেড আয়োডাইডে খরচ পড়ে অনেক কম।

জমাট কারবন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির সাহায্যে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাবার খবর প্রচার হবার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে এ নিয়ে রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃষ্টি নামাবার জন্যে বেশ কতকগুলো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ; ধনী চাষীরা অনাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্যে এদের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। কোথাও কোথাও আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম বৃষ্টি নামানো সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত দাবী করে ব্যবসা যোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক চাষী প্রতারণারও শিকার হলেন।

নানা ধরনের সমালোচনার ফলে মার্কিন দেশের প্রেসিডেণ্ট ১৯৫৩ সালে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। কমিটি বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়ে বললেন, কোন কোন পাহাড়ী অঞ্চলের পাদদেশে শীতকালের ঝড়ো মেঘে রাসায়নিক বস্তু ছিটিয়ে মোট বৃষ্টিপাত ১০-১৫ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব ; কিন্তু অন্যত্র বৃষ্টিপাত বাড়ানো সম্ভব কিনা তা পরিসংখ্যান থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

এদিকে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশে কম ঠাণ্ডা মেঘ থেকে বৃষ্টি নামাবার সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। কোথাও কোথাও

বিশেষ ধরনের মেঘে সূক্ষ্ম লবণকণা ছুঁড়ে বা সূক্ষ্ম পানির ফোয়ারা ছুঁড়ে ভাল ফল পাওয়া গেল।

আসলে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরবার কতকগুলো নিয়মকানুন আছে ; সেই নিয়মকানুনগুলো সম্বন্ধে খোঁজ নিলে দেখা যাবে মেঘের ধরন বুঝে সে মেঘে সূক্ষ্ম জলকণা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরার জন্যে বীজ ছড়াবার কৌশল যথাযথ না হলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে সাফল্য লাভ দুঃসাধ্য।

মেঘে ভাসমান পানির কণার ব্যাস সচরাচর ৫ থেকে ১০০ মাইক্রন (এক মাইক্রন হল মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ)—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ১০ থেকে ৩০ মাইক্রন। কাজেই মেঘকণার গড়পড়তা ব্যাস ২০ মাইক্রন বলে ধরা যেতে পারে। অথচ বৃষ্টির ফোঁটার গড়পড়তা ব্যাস ২ মিলিমিটার ; অর্থাৎ গড় আকারের মেঘকণার চাইতে একশ' গুণ বেশি। পানির ফোঁটার ঘন-আয়তন নির্ভর করে ব্যাসের ত্রিঘাতের ওপর। কাজেই অন্তত লাখ খানেক মেঘকণা একসাথে জড়ো হলে তবে একটা মাঝারি আকারের বৃষ্টির ফোঁটা তৈরি হয়। আর এজন্যেই মেঘের আকার যদি রীতিমতো বড় না হয় তাহলে তা থেকে চলনসই পরিমাণের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম।

সচরাচর আকাশে যে সব মেঘ দেখা যায় তার মধ্যে বেশির ভাগ হল স্তরমেঘ বা নিচু স্তূপমেঘ। এসব মেঘে পানির পরিমাণ থাকে প্রতি ঘন-মিটার আয়তনে মাত্র এক গ্রামের মতো। অর্থাৎ মেঘ যদি হয় এক কিলো-মিটার বা হাজার মিটার উঁচু তাহলে তাকে সম্পূর্ণ ঝরিয়ে দিলেও বৃষ্টি পড়বে প্রতি বর্গ-মিটার এলাকায় মাত্র হাজার গ্রাম ; অর্থাৎ জমিতে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ হবে মাত্র এক মিলিমিটার উঁচু। অথচ অন্তত এক ইঞ্চি বা ২৫ মিলিমিটার পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে তাতে মাটির ওপরের স্তর সামান্য ভেজে মাত্র কিন্তু চাষবাসের জন্যে তেমন কোন লাভ হয় না।

কাজেই আকাশে যদি মেঘ খুব পুরু না হয় আর তাতে যথেষ্ট পরিমাণে পানি ভেসে না থাকে তাহলে সে মেঘে যতই রাসায়নিক বস্তু ছড়ানো যাক না কেন তা থেকে সুবিধেমতো পরিমাণে বৃষ্টি নামানো যাবে না। মেঘ যদি ওড়ে বেশ উঁচু দিয়ে আর হাওয়া থাকে শুকনো, তাহলে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামতে নামতে অনেক সময় বাষ্প হয়ে উবে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে খরায় আক্রান্ত বেশির ভাগ জায়গাতেই আকাশে তেমন মেঘ জমে না, আর হাওয়াও থাকে রীতিমতো শুকনো। কাজেই ইচ্ছেমতো বৃষ্টি নামাবার ব্যাপারে এই

সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতেই হবে।

বিমান বন্দরের রানওয়েতে শূন্য ডিগ্রির নীচে অতিশীতল কুয়াশা জমলে তা সিলভার আয়োডাইডের ধোঁয়া ছড়িয়ে সহজেই পানি করে ঝরিয়ে দেয়া যায়। এই পদ্ধতি আজকাল দুনিয়ার নানা দেশে চালু হয়েছে। তবে কুয়াশার তাপমাত্রা যদি শূন্য ডিগ্রির ওপরে হয় তাহলে এই পদ্ধতি কাজ দেয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনো কখনো বিশাল বনাঞ্চলে দাবানল লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়। এসব দাবানল নেবানোর জন্যে সে দেশের বিজ্ঞানীরা উড়োজাহাজ থেকে মেঘে লেড আয়োডাইড আর কপার সালফেট (তুঁতে) -এর গুঁড়ো ছড়িয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। দশ ঘন কিলোমিটার আকারের মেঘের অতিশীতল এলাকায় মাত্র একশ' গ্রাম (অর্থাৎ প্রায় ন' তোলা) তুঁতে বা দশ-পনের গ্রাম (প্রায় এক তোলা) লেড আয়োডাইড ছড়িয়ে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে মেঘের জলকণা জমে তুষারকণা সৃষ্টি হতে থাকে। তারপর মিনিট পনের পরেই সেই বরফকণা বৃষ্টি হয়ে ঝরতে শুরু করে। বলা বাহুল্য তুঁতে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত বেশি লাগলেও দাম কম বলে শেষ পর্যন্ত এতেই খরচ সস্তা হয়। তবে এমন মেঘে গুঁড়ো ছড়াতে হবে যা মিনিট পনের পরে দাবানলের জায়গার ওপর এসে পৌঁছবে।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানো ছাড়াও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়েছে মেঘের শিল ঝরার হাত থেকে খেতের ফসল রক্ষা করার দিকে। বছরের প্রতি দিন পৃথিবীর নানা অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে গড়ে ৪৫,০০০ বজ্রবৃষ্টি। আর এর মধ্যে অনেকগুলো থেকেই ঝরছে শিল। এসব শিল ফসল আর সম্পদের প্রচুর ক্ষতি ঘটায়। বেশির ভাগ শিল মটর দানা থেকে আঙুরের মতো আকারের হলেও তিন বা চার ইঞ্চি চওড়া শিল পড়ার খবরও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। একটা হিসেবে দেখা যায় শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর শিলাবৃষ্টি থেকে ফসল আর ধনসম্পদের ক্ষতি হয় পঞ্চাশ কোটি ডলারের ওপরে। এই শিলাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল বাঁচাবার জন্যে মানুষের চেষ্টা বহু কাল ধরে।

এই শতকের চল্লিশের দশকে উত্তর ইতালীতে চাষীরা শিল তাড়াবার জন্যে আকাশের দিকে ব্যাপকভাবে রকেট ছুঁড়তে শুরু করে। কার্ড-বোর্ডের তৈরি এসব সস্তা রকেট মাটি থেকে ওপরে ওঠে মাত্র আধ মাইল কি এক মাইল; তারপর ওপরে বারুদের বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে শিল

পড়া কি করে বন্ধ হয় তা খুব স্পষ্ট নয়। তবে চাষীদের ধারণা এমনি রকেট বিস্ফোরণের ফলে মেঘ থেকে শিল পড়লেও তা আকারে হয় ছোট আর কিছুটা নরম ; শিল আকারে ছোট হলে তা অনেক সময় মাটিতে পড়ার আগেই গলে যায়। এমনি রকেট চীন, ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডেও চাষীরা ছুড়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা বললেন শিল জমার জন্যে দরকার মেঘে যথেষ্ট পরিমাণ অতিশীতল পানির কণা আর দরকার শিল জমার জন্যে বরফকণার বীজ। যদি কোন উপায়ে পানির কণার সংখ্যা কমিয়ে বরফকণার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ভাগাভাগি হয়ে যাবে অসংখ্য বীজের মধ্যে ; কাজেই শিল আকারে তেমন বড় হতে পারবে না। এক ঢিলে দু'পাখি মারা যেতে পারে এ ধরনের মেঘে সিলভার আয়োডাইডের ধোঁয়া ছড়িয়ে। বেশি সংখ্যায় বীজ ছড়িয়ে যাবার ফলে জমবে অসংখ্য বরফ-কণা, কিন্তু বিপদ ঘটাবার মতো বড় আকারের শিল তৈরি সম্ভব হবে না। সুইজারল্যান্ডে এ ধরনের পরীক্ষা চালানো হল বছর পাঁচেক ধরে ; তাতে নির্ভরযোগ্য কোন ফলাফল পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে আর কানাডায়।

এসব দেশে এই পদ্ধতি ব্যাপক আকারে ব্যবহার করা হচ্ছে। রকেট আর গ্রেনেডের সাহায্যে অতিশীতল ঝড়ো মেঘের ভেতর ছুড়ে দেয়া হয় সিলভার আয়োডাইড এবং অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান ; আর তার ফলে সে মেঘের পানি বৃষ্টি হয়ে ঝরে যায় শিল জমাবার সুযোগ না দিয়েই। সোভি-য়েত বিজ্ঞানীরা বলছেন সে দেশে রেডারের সাহায্যে শিলাবৃষ্টি হতে পারে এমন মেঘের হদিস নিয়ে তার দিকে গ্রেনেড ছুড়ে রাসায়নিক বস্তু ছড়াবার ফলে ফসলের ওপর শিল ঝরার ক্ষতি আশি থেকে নব্বই শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে।

সোভিয়েতের ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া প্রজাতন্ত্রে আর মধ্য এশিয়ায় গড়ে উঠেছে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডার, রকেট আর বিমান বিধ্বংসী কামান সজ্জিত অসংখ্য শিলা বিরোধী কেন্দ্র। শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে আঙুরের কুঞ্জ, তুলার খেত। বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে গ্রেনেড ছুড়ে দেয়া হচ্ছে দু' থেকে দশ মাইল দূর পর্যন্ত মেঘে। এক একটি কেন্দ্র এভাবে রক্ষা করছে প্রায় পাঁচ লক্ষ একর জমি। আর যে সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে এই

রক্ষা ব্যবস্থার খরচ পড়ছে সমগ্র ফসলের উৎপন্ন মূল্যের মাত্র এক শতাংশের মতো।

শুধু শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধ নয়, বজ্রমেঘ থেকে বজ্রপাত ঠেকাবার জন্যেও চেষ্টা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এ জন্যে পরীক্ষা চালাচ্ছেন মেঘের ভেতর সিলভার আয়োডাইড ছুঁড়ে। আরেক পদ্ধতিতে মেঘের ভেতর ছোট আকারের অসংখ্য বিদ্যুৎক্ষরণ ঘটিয়ে বড় রকম বজ্রপাত ঠেকাবার জন্যে মেঘের ভেতর ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে ধাতব সূচের পুঞ্জ।

বিশাল সামুদ্রিক সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা কমাবার জন্যেও চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। একেকটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে যে পরিমাণ শক্তি জমা হয় তার পরিমাণ বিপুল। একটি মাঝারি সাইক্লোনে প্রতি ঘণ্টায় যে শক্তি ছাড়া পায় তা কয়েকটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণক্ষমতার সমান। এই বিপুল তেজকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কথা নয়। তবু বিজ্ঞানীরা বললেন সাইক্লোনের ঘূরপাক খাওয়া হাওয়ার বাইরের ঠাণ্ডা স্তরে যদি সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে বাষ্প জমে পানি হবার ফলে সেখানে প্রচুর তাপ ছাড়া পাবে। এর ফলে ভেতরকার স্তরে হাওয়ার বেগ কমে যেতে পারে। এ বিষয়ে এ যাবৎ যেসব পরীক্ষা হয়েছে তা থেকে এখনও খুব স্পষ্ট ফলাফল পাওয়া যায়নি।

বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতিতে ছোটখাট আকারে মেঘ-বৃষ্টিকে প্রভাবিত করার কৌশল আজ মানুষের আয়ত্ত। খরার সময় যখন-তখন খুশিমতো বৃষ্টি নামাতে না পারলেও সুবিধেমতো ক্ষেত্রে বৃষ্টি নামানো বহু দেশে সম্ভব হয়েছে। দরকারমতো শহর এলাকা বা এমনি আর কোন এলাকার বাইরে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে সে এলাকাকে বৃষ্টিমুক্ত রাখাও আজ কঠিন কিছু নয়। অবশ্য এজন্যে মেঘের ধরন, মেঘ কত উঁচুতে, তার তাপমাত্রা, কোন্ দিক থেকে কত জোরে হাওয়া বইছে এমনি নানা বিষয় বিবেচনা করার রয়েছে।

এবার মানুষ আরো বড় আকারে জলবায়ু বদলাবার পথে এগোবার কথা ভাবছে। ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ডেনমার্ক পর্যন্ত ইউরোপের উত্তর উপকূলে আর নরওয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়ার প্রবল আঘাতে জমি থেকে প্রচুর পানি বাষ্প হয়ে উবে যেতে থাকে আর তার ফলে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এসব অঞ্চলে সমুদ্রের উপকূলে গাছপালা লাগিয়ে হাও-

য়ার জন্যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনি বিপুল আকারে বৃক্ষরোপণ করে হাওয়ার বাধা তৈরি হয়েছে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে। বসন্তকালে এসব এলাকার ওপর দিয়ে প্রবল শুকনো দক্ষিণ-পূর্ব হাওয়া বয়ে গিয়ে মাটির ওপরকার উর্বর স্তর উড়ে যেত—তা ঠেকিয়েছে এই বনাঞ্চল।

মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি উত্তর রাশিয়া, সাইবেরিয়া, আলাস্কা এসব অঞ্চলে শীতকাল যেন আর শেষ হতে চায় না ; মাটি বরফে ঢাকা থাকে জুন মাস পর্যন্ত। তার ফলে গ্রীষ্মের প্রচুর সূর্যকিরণ শাক-সবজি ফলাবার কাজে লাগানো যায় না। তুষারের স্তর উজ্জ্বল সাদা বলে তার গা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে যায় প্রায় ৮০ শতাংশ, তাই ভূমি সহজে গরম হয় না। কিন্তু তুষারের ওপর যদি ছড়িয়ে দেয়া যায় কয়লার গুঁড়ো, তাহলে সে জমি থেকে আলোর প্রতিফলন কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩০-৪০ শতাংশ। এর ফলে বরফ গলে যায় তাড়াতাড়ি। জমিকে তাড়াতাড়ি বরফমুক্ত করার জন্যে এই পদ্ধতি সোভিয়েত ইউনিয়নে সাফল্যের সাথে কাজে লাগানো হয়েছে।

এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এক সুদূরপ্রসারী প্রকল্প প্রস্তাব করেছেন একজন মার্কিন ও একজন সোভিয়েত আবহবিজ্ঞানী—সম্পূর্ণ পৃথকভাবে। তাঁদের নাম যথাক্রমে ওয়েক্সলার (H. Wexler) ও বুদিকো (M. I. Budyko)। তাঁরা দুজনেই লক্ষ্য করেন যে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে উত্তর সাগরে বরফের স্তূপের পরিমাণ যথেষ্ট কম-বেশি হয়েছে। প্রাচীনকালে এক সময় এই এলাকা দীর্ঘকাল ছিল বরফমুক্ত। মধ্যযুগের পর থেকে বরফের এলাকা বেড়েছে প্রায় বিশ শতাংশ। গত কয়েক শতকে বরফের স্তূপের উচ্চতা ৬০ ইঞ্চি আর ১০০ ইঞ্চির মধ্যে ওঠা-নামা করেছে।

তাঁরা আরো দেখলেন উত্তর সাগর এলাকায় গ্রীষ্মকালে বরফ গলার সময় মাত্র আড়াই মাসের মতো। প্রথমে গলে যায় ওপরের তুষারের স্তর ; তারপর গলতে থাকে তলার বরফ। দশ ইঞ্চি পুরু বরফের স্তর গ্রীষ্মকালে সম্পূর্ণ গলে যায় ; আবার শীতকালে নিচের দিক থেকে জমতে শুরু করে। বুদিকো হিসেব করে দেখালেন, যদি কোন উপায়ে বরফের স্তর একেবারে গলিয়ে ফেলা যায় তাহলে গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ পড়ে সমুদ্রের পানিতে এত তাপ জমা হবে যে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শীতকালেও সমুদ্রের তাপমাত্রা থাকবে হিমাঙ্কের যথেষ্ট ওপরে। তার ফলে উত্তর সাইবেরিয়া আর কানাডার স্থলভাগ থেকে যে ঠান্ডা হাওয়া বয় তাতে উপকূল বরাবর মাত্র ১২৫-২০০ কিলোমিটার (বা ৭৫-১২৫ মাইল) পর্যন্ত সমুদ্রে বরফ জমতে

পারে। বাকি উত্তর সাগর থাকবে সারা বছর বরফমুক্ত।

গ্রীষ্মের সূর্যকিরণ সবচেয়ে প্রখর হয়ে ওঠার আগে অর্থাৎ মে মাসের দিকে যদি তুষারের ওপর কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে তুষারের কিরণ-বিচ্ছুরণ ক্ষমতা ৮০ শতাংশ থেকে নেমে ৪০-৫০ শতাংশে এসে দাঁড়াবে। তার ফলে দীর্ঘায়িত হবে গ্রীষ্ম আর দ্রুততর হবে বরফ গলার হার।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে একে কার্যকরী করা মোটেই তেমন সহজ হবে না। এভাবে হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে কয়লার গুঁড়ো ছোঁড়ার ব্যয় দাঁড়াবে মহাকাশ অভিযানের ব্যয়ের অঙ্কের কাছাকাছি। প্রয়োজন হবে নানা দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার। উত্তর সাগরে বরফের স্তূপ অদৃশ্য হলে আবহমন্ডলে যে সব পার্শ্ব প্রতি-ক্রিয়া ঘটবে তার কথাও আগে ভাগেই ভেবে দেখতে হবে। পৃথিবীর নিয়ত বায়ু প্রবাহের বর্তমান সীমানাগুলো হয়তো সবই এগিয়ে যাবে কিছুটা উত্তর দিকে। তার ফলে বিভিন্ন দেশের জলবায়ুতে ঘটতে পারে স্থায়ী ও সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন।

এসব বিষয় বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে বিবেচনা করছেন। এ ধরনের বড় আকারের প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে কতদিন লাগবে তা বলা শক্ত হলেও এমন বিশাল আকারে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের বিষয় যে বিবেচিত হচ্ছে এটাই তাৎপর্যপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে মানুষ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বসতি পেতে, বন-জঙ্গল কেটে ফেলে, বিশাল বাঁধ বসিয়ে, জলসেচ প্রকল্প গড়ে তুলে, জলাভূমির পানি সরিয়ে, নদীর প্রবাহ পালটে দিয়ে নিজের জ্ঞাতসারে বা অজানতে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। এসব পরিবর্তনের নিয়মকানুন আজ আবহবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। সেই সঙ্গে এসব পরিবর্তনের কল্যাণকর আর অকল্যাণকর দুটো দিকই মানুষ আগের চাইতে অনেক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের কৌশল মানুষের আয়ত্ত হবার ফলে কোন দেশ তা অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে পারে—এ প্রশ্নও ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। ষাটের দশকের শেষে আর সত্তরের দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে অভিযোগ ওঠে যে, হানাদার বাহিনী ভিয়েতনাম আর লাওসে বিমান থেকে রাসায়নিক বস্তু ছড়িয়ে আব-

হাওয়া বদলে দিচ্ছে যাতে প্রবল বৃষ্টিতে গ্রাম ভেসে যায়, বনজঙ্গলের পাতা ঝরে পড়ে, খরায় ফসল নষ্ট হয়। অবশেষে আবহাওয়াকে যুদ্ধের কাজে প্রয়োগের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে; আবহাওয়া আর প্রাকৃতিক পরিবেশকে যুদ্ধ বা আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করে স্বাক্ষরিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সনদ।

দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ প্রকৃতিকে ক্রমেই বেশি করে বুঝতে আর বেশি করে কাজে লাগাতে শিখেছে। আকাশের মেঘের প্রকৃতি, দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা বায়ুপ্রবাহ আর ঝড়ের রীতিনীতি, সমুদ্র ডাঙ্গা আর সূর্যের মধ্যেকার নিগূঢ় সম্পর্ক মানুষ অতি সম্প্রতি বুঝতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে মেঘের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এসেছে কিছুটা সাফল্য। আবহাওয়ার নিয়মকানুন জেনে মানুষ হয়তো ভবিষ্যতে আবহাওয়ার ওপর আরো ব্যাপক, আরো নির্ভর-যোগ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা আয়ত্ত হবার সাথে সাথে সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর এসে পড়ছে নতুন দায়িত্বও। কেননা এই ক্ষমতা যেমন প্রযুক্ত হতে পারে মানুষের কল্যাণে তেমনি এর দায়িত্বহীন প্রয়োগের ফলে বিপন্ন হতে পারে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রা, এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত। স্বভাবতই এর ফলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কি শুধু গুটিকতক রাষ্ট্রনায়ক বা ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে, না এই প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণ মানুষের বক্তব্য ও স্বার্থ প্রাধান্য পাবে এ প্রশ্নও আজ দেখা দিয়েছে।

বলা বাহুল্য এ প্রসঙ্গ বিজ্ঞানের আরো অন্যান্য নানা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু আবহাওয়ার গবেষণা যেভাবে বিপুল আকারে পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা সারা দুনিয়ার মানুষকে আজ বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকেই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। নানা দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরামর্শ এবং কোন বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণ করার আগে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাই আজ এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ অবদান হলেও এর ফলাফল প্রভাবিত করবে দুনিয়াজোড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে। তাই বড় আকারের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভা

শুধু গুটিকতক মানুষের ওপর ছেড়ে দেয়া মোটেই নিরাপদ নয়। দুনিয়ার দেশে দেশে সাধারণ মানুষকে জানতে হবে বিজ্ঞানীদের এসব গবেষণার প্রকৃতি আর ভালমন্দ ফলাফলের কথা। আর দুনিয়াজোড়া ব্যাপক আলোচনা আর বিবেচনার ভিত্তিতেই এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।
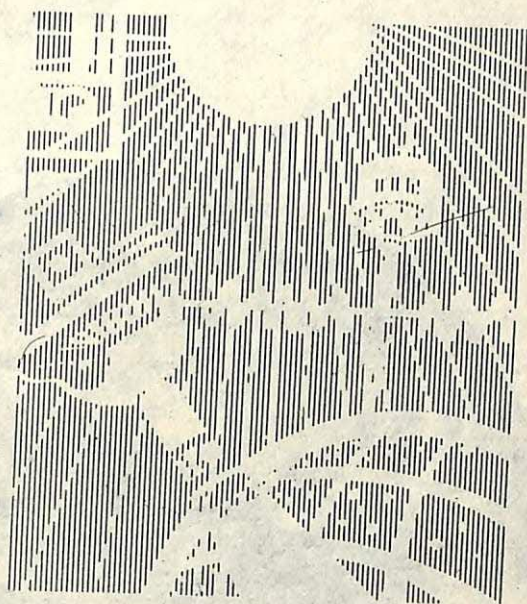
রশ্মিময় জগৎ

মানুষের ধরাছোঁয়ার এলাকার বাইরে রয়েছে রশ্মিময় এক আশ্চর্য জগৎ। দৃশ্য এবং তার চেয়েও ব্যাপক অদৃশ্য এ রশ্মিজগতের প্রভাব আমাদের জীবনে কিছুমাত্র কম নয়। মানুষ এ জগতের সন্ধান পেয়েছে মাত্র গত এক শতকে; আর রশ্মিজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে তার জীবনের অজস্র প্রয়োজনে।

সূর্য থেকে শক্তি

০ ০
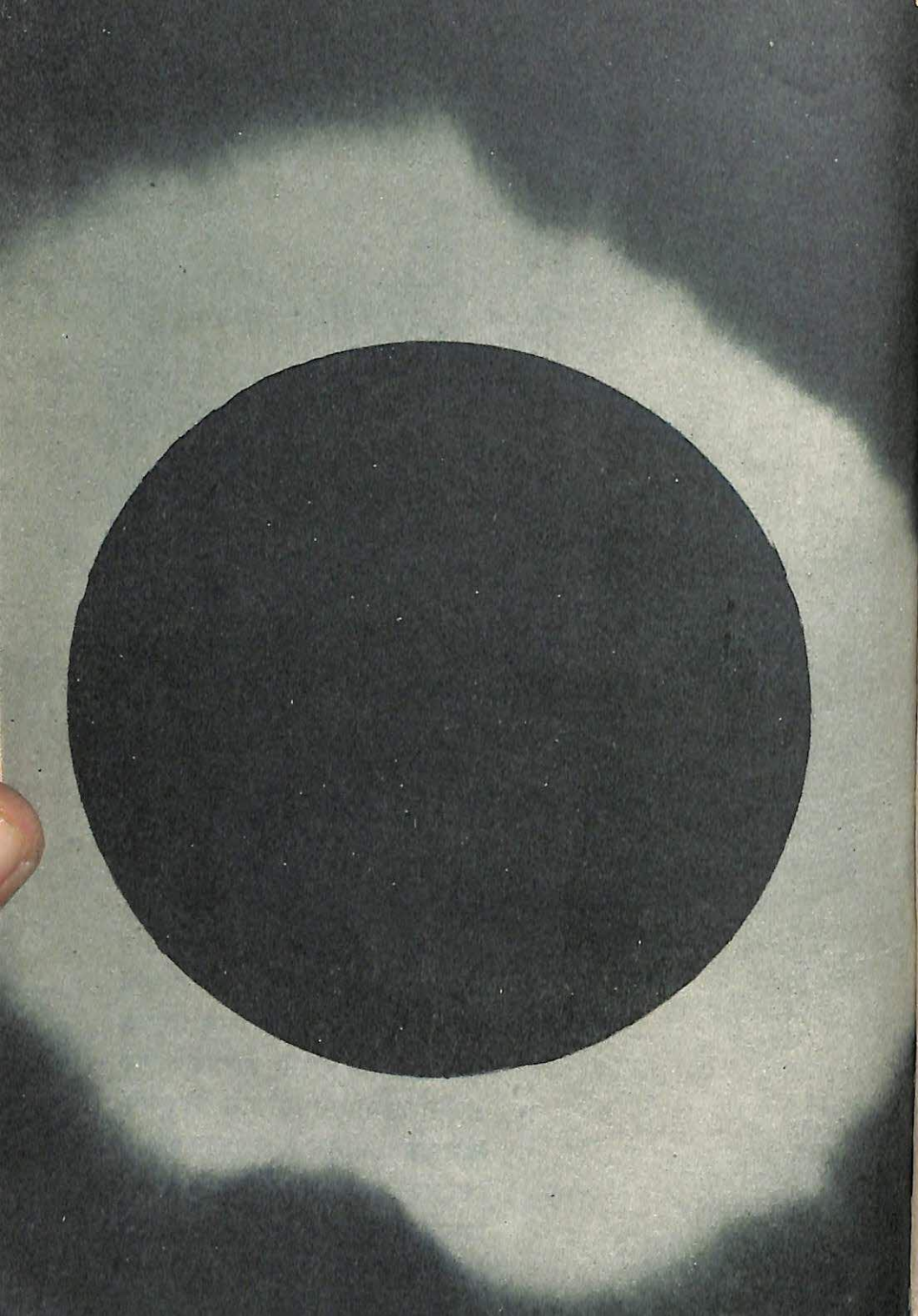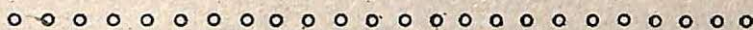
আমাদের পৃথিবীর উৎপত্তি ঠিক কবে আর কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও নানা মত, নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু এই পৃথিবীর ওপর প্রাণের স্পন্দন, প্রায় সকল গতি আর কর্ম-চাঞ্চল্যের মূলে রয়েছে সূর্যের প্রাণঢালা আলোর বর্ষণ এ সত্য সবার কাছে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

সূর্য পৃথিবীতে আলো দিচ্ছে পৃথিবীর জন্মের শুরু থেকেই, অর্থাৎ প্রায় পাঁচশ' কোটি বছর ধরে। সূর্যের জন্ম হয়েছে সম্ভবত হাজার কোটি বছর আগে আর সূর্য বেঁচে থাকবে হয়তো আরো অন্ততঃ দু'তিন হাজার কোটি বছর। সে হিসেবে মানুষের তৈরি বিজলির আলোর উদ্ভব সেই সেদিন—আজ থেকে মাত্র শ' খানেক বছর আগে। চুম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করার কৌশল প্রথম জানা যায় ১৮৩১ সালে; কিন্তু এডিসন প্রথম বায়ুশূন্য বাল্বে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হলেন ১৮৭৯ সালে। তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে সারা পৃথিবী আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে শুধু যে কাজের সময় দীর্ঘায়িত হল তাই নয়, বিদ্যুতের শক্তিতে চলতে লাগল কল-কারখানা, পরিবহন আর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এল বিপ্লব।

কিন্তু এই বিপ্লব ইতিমধ্যে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্যে দরকার জ্বালানি—যেমন কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। এ সব জ্বালানি হল মূলতঃ সূর্যেরই শক্তি—রাসায়নিক শক্তির আকারে বন্দী হয়ে রয়েছে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এগুলো হল অনবায়নযোগ্য শক্তি, অর্থাৎ একবার ফুরিয়ে গেলে আর সহজে সৃষ্টি হবে না। অথচ আজ পৃথিবীতে যে হারে শক্তির ব্যবহার হচ্ছে তাতে আগামী শতকের শুরুতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে দুনিয়ার সব খনিজ তেল আর গ্যাসের সঞ্চয়। তারপর থাকবে শুধু কয়লা—কিন্তু সেও মাত্র শ'দুই বছর। পৃথিবীর সীমাবদ্ধ

পরিমাণ কয়লা শেষ হয়ে গেলে বাকি থাকবে শুধু বনের গাছপালার কাঠ, জলবিদ্যুৎ আর এই জাতের অল্প কিছু নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।

আসলে পারমাণবিক শক্তি ছাড়া দুনিয়ার আর সব শক্তিরই—সে খনিজ হোক বা অখনিজই হোক—গোড়ার উৎস হল সূর্য। সূর্যের যে বিপুল শক্তি পৃথিবীর ওপর পড়ে তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সাথে সাথেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় মহাশূন্যে ; মোটামুটি অর্ধেক শুষে নেয় পৃথিবীর মাটি-পাথর, সাগর-মহাসাগর আর গাছপালা ; বাকিটা শুষে নেয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। সূর্যের এই তাপশক্তি শুষে পানি বাষ্প হয়ে ওঠে আকাশে ; তার খানিকটা জমা হয় উঁচু পাহাড়ের খাদে বা হ্রদে। এই পানি গড়িয়ে নিচে নামার সময় তার স্থিতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সৃষ্টি করে জলবিদ্যুৎ। দুর্ভাগ্যক্রমে দুনিয়ার সব দেশে (যেমন বাংলাদেশে) যথেষ্ট পরিমাণে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টির সুবিধে নেই ; যথেষ্ট পারমাণবিক জ্বালানিও নেই।

খনিতে যে কয়লা পাওয়া যায় তা এসেছে বহু প্রাচীন কালে বিপুল পরিমাণ উদ্ভিদ জলা জায়গায় মাটি-কাদার তলায় চাপা পড়ে। বহু কোটি বছর ধরে মাটির তলায় চাপা থাকার ফলে তাপ, চাপ আর জীবাণুর প্রভাবে উদ্ভিদের দেহ পরিণত হয়েছে কয়লায়। তেমনি আজ মাটির নীচে যে খনিজ তেল বা খনিজ গ্যাস পাওয়া যায় তারও সৃষ্টি বহু কোটি বছর আগে অজস্র প্রাণীদেহ সমুদ্র বা জলার পানির তলায় জমে। তার ওপর বহু যুগ ধরে স্তরে স্তরে জমেছে মাটি আর কাদাবালি। বহু লক্ষ বছরে সে সব পরিণত হয়েছে পাথরের স্তরে। চাপ, তাপ, জীবাণুর ক্রিয়ায় প্রাণিদেহের তৈলাক্ত অংশের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটার ফলেই খনিজ তেল আর গ্যাসের উদ্ভব। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে ঘটেছে নানা ওলট-পালট। সমুদ্র উঁচু হয়ে উঠে সৃষ্টি হয়েছে ডাঙ্গা, কোথাও পর্বত। ডাঙ্গা ডুবে গিয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে সমুদ্র। আর স্তরীভূত বা পাললিক শিলার খাঁজে খাঁজে জমে আছে খনিজ তেল আর গ্যাস। অর্থাৎ এসবের শক্তি হল উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহ বহু কোটি বছর আগে সূর্য থেকে যে শক্তি জমিয়েছিল তারই রাসায়নিক রূপান্তর।

একই ভাবে আজকের সব উদ্ভিদ আর প্রাণিদেহের যে রাসায়নিক শক্তি তারও গোড়ার উৎস সূর্য। তবে কোন প্রাণীই সূর্য থেকে এই শক্তি

সরাসরি নিজের দেহে জমাতে পারে না। পারে শুধু উদ্ভিদের সবুজ পাতা বা কচি কাণ্ডের সবুজ অংশ।

উদ্ভিদের পাতায় থাকে ক্লোরফিল বা পত্রহরিৎ নামে এক আশ্চর্য রাসায়নিক বস্তু। এই বস্তুটি চারপাশের হাওয়া থেকে গ্রহণ করে কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস, আর মাটি থেকে নেয় পানি। তারপর সূর্য থেকে পাওয়া আলোকরশ্মির সাহায্যে পানির অণুকে ভেঙে ফেলে হাইড্রোজেন আর অকসিজেন পরমাণুতে। এতেই প্রথম জমা হয় খানিকটা রাসায়নিক শক্তি। ক্রমে ক্রমে নানা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার স্তর পেরিয়ে কারবন ডাই-অকসাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলন ঘটে সৃষ্টি হয় গ্লুকোজ বা শর্করা। আলোকরশ্মির সাহায্যে আরো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় আরো বড় আর জটিল অণু যেমন স্টার্চ বা শ্বেতসার-শর্করা (যা চাল আর গমের প্রধান উপাদান), সেলুলোজ (যা গাছের কাণ্ডের বা কাঠের প্রধান উপাদান), নানা জাতের প্রোটিন প্রভৃতি বস্তু।

উদ্ভিদ থেকে পাই আমরা আমাদের সব খাদ্যশস্য, ফল-মূল প্রভৃতি ; এসব খেয়ে আমাদের দেহে সৃষ্টি হয় কর্মশক্তি। উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে বহু প্রাণী। এসব প্রাণীর দেহে জমা হয় উদ্ভিদের শক্তি। প্রাণীর মাংস, দুধ, মাখন খেয়েও মানুষ তার দেহে শক্তি সঞ্চয় করে। উদ্ভিদের দেহ বা কাঠ পুড়িয়ে মানুষ সংগ্রহ করে নানা কাজের জন্যে শক্তি। এমনি করে সূর্যের শক্তি গাছের পাতার ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত হবার ফলেই উদ্ভিদ আর প্রাণিজগতের বেঁচে থাকার জন্যে আর কাজের জন্যে সব শক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

গাছের পাতার ওপর সূর্যের যে পরিমাণ শক্তি এসে পড়ে পাতা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তার মাত্র এক-শতাংশকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে বন্দী করে রাখতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে যে; মাত্র এই এক ভাগ সৌরশক্তি কাজে লাগানো থেকেই উদ্ভব আমাদের সকল খাদ্যবস্তুর আর সকল নবায়নযোগ্য জ্বালানির।

এ যাবৎকাল মানুষের সভ্যতার সকল অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে উদ্ভিদের জমিয়ে রাখা সৌর-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। আদিম মানুষ বনের গাছের কাঠ চিরে আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। তার বহু হাজার বছর পর মানুষ শিখল বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করে তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করতে। অবশেষে মাত্র শ'খানেক বছর আগে এল বিদ্যুতের যুগ—মানুষ যান্ত্রিক

শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করতে শিখল। আসলে এ সবই হল সূর্যের জমানো শক্তিরই নানা রূপান্তর।

আজ যখন পৃথিবীতে জমানো সৌরশক্তি অর্থাৎ অনবায়নযোগ্য জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে আসার পথে তখন আবার বিজ্ঞানীদের নতুন করে দৃষ্টি পড়েছে সূর্যের দিকে। সূর্যের বিপুল শক্তিকে কি কোন উপায়ে সরাসরি মানুষের কাজে লাগানোর উপায় বের করা যায় না? নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর মাধ্যমে কি করে সৌর-শক্তিকে আরো বেশি কাজে লাগানো যায়? সারা দুনিয়ায় আজ অসংখ্য বিজ্ঞানী এসব প্রশ্নের জবাব বের করার জন্যে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দিনের আকাশে সূর্য নামে যে জ্বলজ্বলে আগুনের গোলাটা সারা পৃথিবীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয় তাকে পৃথিবী থেকে দেখতে ছোটখাট মনে হলেও আসলে তার আয়তন অতি বিশাল। সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮,৬৫,০০০ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে একশ' গুণেরও বেশি, আর আয়তনে তা পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। এই বিশাল আগুনের গোলা থেকে যে বিপুল পরিমাণ তেজ সর্বক্ষণ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে তার পরিমাণ মাপা সহজ নয়। তবে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন এই তেজের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ—মাত্রই দু'শ' কোটি ভাগের এক ভাগ পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে। পৃথিবীর মানুষ কাজে লাগায় তার আরো অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। বহু কোটি বছর ধরে এই তেজের এক হাজার ভাগেরও কম অংশ আটকা পড়েছে পৃথিবীর বুকে গাছপালা বা খনিজ জ্বালানি হিসেবে। পৃথিবীর সব খনিতে মিলে এ যাবৎ মানুষ যে পরিমাণ সঞ্চিত জ্বালানির খোঁজ পেয়েছে তার সমান শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে মাত্র এক সপ্তাহে। আর মানুষ সারা বছরে সব রকম উৎস থেকে যত শক্তি ব্যবহার করে ততটা শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে মাত্র দশ মিনিটে।

অন্য সব শক্তির মতো সূর্যের শক্তি অদূর ভবিষ্যতে ফুরিয়ে যাবার ভয় নেই; সূর্যের আলো কিনতে পয়সা খরচ করতে হয় না, প্রায় অফুরন্ত সূর্যকিরণ পৃথিবীতে পড়ছে সারা বছর ধরে। বিশেষ করে বিষুব রেখার কাছাকাছি উষ্ণমন্ডলে যেসব দেশ সেগুলোতে মোটামুটি খাড়া তীব্র সূর্যকিরণের কোন ঘাটতি নেই। তেল বা কয়লা ব্যবহার করলে ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাসে পরিবেশ দূষণের ভয় আছে; সূর্যকিরণে সে সমস্যাও নেই।

তবে সমস্যা হল এই বিনি পয়সার কিরণ সংগ্রহ করা আর তাকে জমিয়ে রাখা। সেও রীতিমতো ব্যয়সাধ্য।

মানুষ সরাসরি সূর্যের তাপশক্তিকে কিছুটা পরিমাণে ব্যবহার করছে বহু হাজার বছর ধরে। আমরা শীতের দিনে গোসলের পানি গরম করি রোদে রেখে, ফসল মাড়িয়ে শুকোই সূর্যের আলোয়, ধোয়া কাপড় শুকোই রোদে মেলে দিয়ে; মাছ শুকিয়ে শুটকি করা হয় রোদে (শুধু এক কক্সবাজারের সমুদ্র তীরেই বছরে প্রায় এক লাখ টন মাছ শুকনো হয়); সমুদ্রের পানি রোদের তাপে শুকিয়ে তৈরি হয় নুন। এসবই সূর্যের আলোকে মানুষের কাজে ব্যবহারের নানা পন্থা।

এসব পুরনো পন্থাকে নতুনভাবে কাজে লাগাবার দিকেও আজ বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি দিয়েছেন। বিশেষ করে শীতের দেশে প্রচুর জ্বালানি খরচ করতে হয় শুধু ঘরবাড়ি গরম রাখতে আর পানি গরম করতে। এজন্যে কালো রঙ করা কাচের প্যানেলযুক্ত ছাদ আর নতুন ধরনের দেয়াল (সূর্যের দিকের) ব্যবহার করে বিশেষ ডিজাইনের বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। আর তার ফলে এসব বাড়িতে ঘর গরম রাখা আর পানি গরম করার জন্যে জ্বালানির ব্যবহার কমেছে শতকরা অন্তত ৭৫ ভাগ।

কালো রঙের কাচ সহজেই সূর্যের তাপরশ্মি শুষে নেয়। তার তলায় নলের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় পানি। এই পানি তাপে গরম হয়ে ওঠে। তারপর বাড়ির নীচে বিশেষ ধরনের সঞ্চয় কোষে এই তাপ-শক্তি জমিয়ে রাখা যায়। শীতকালে এই তাপে ঘরের হাওয়া গরম হয়। গ্রীষ্মকালে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক তরলবস্তু বাষ্পীভূত করে এই তাপশক্তির সাহায্যে ঘর ঠান্ডাও করা যায়। এ ধরনের অসংখ্য বাড়ি ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশে।

এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে মরুভূমির দেশে নোনা পানি থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে প্রায় বিনি খরচায় নোনা পানি থেকে মিষ্টি পানি পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু ঘর গরম রাখা বা পানি গরম করার জন্যে যতটা তাপমাত্রা দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশি তাপমাত্রা দরকার কলকারখনা চালাবার কাজে। সৌরশক্তিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হলে, বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে জমাতে হলে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হলে চাই ঢের বেশি তাপমাত্রা। অর্থাৎ চাই সৌরশক্তিকে ঘনীভূত করার পন্থা।

আতশী কাচ দিয়ে সূর্যের শক্তিকে ঘনীভূত করে এক টুকরো কাঠ, কাগজ বা পাতা পুড়িয়ে ফেলতে একটি ছোট ছেলেও পারে। পেটমোটা আতশী কাচ দিয়ে ছোটখাট আকারে সূর্যের তেজকে জড়ো করা যায়। বড় আকারে সূর্যের তেজ জড়ো করার ব্যবস্থা কিছুটা শক্ত কিন্তু দুঃসাধ্য নয়। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্যারাবোলা বা অধিবৃত্তের আকারে প্রায় দশ বর্গফুট চকচকে ধাতব পাতের সাহায্যে এমন প্রতিফলক সৌরচুল্লি তৈরি করেছেন যাতে কড়া রোদে বসালে তিরিশ-চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পাঁচ-ছ জনের জন্যে ভাত রান্না হতে পারে। এমনি সৌরচুল্লি নিয়ে আজ দুনিয়ার বহু দেশে পরীক্ষা চলছে।

এ ধরনের প্রতিফলক সৌরচুল্লি আরো বড় আকারে করা যেতে পারে অনেকগুলো ছোট ছোট আয়না অধিবৃত্ত আকারে সাজিয়ে। প্রতিফলকের সাথে এমন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা যায় যেন তা ক্রমাগত সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে ; এতে ১০০ থেকে ৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সহজেই পাওয়া যেতে পারে। এই তাপমাত্রা ছোটখাট রাসায়নিক বা অন্যান্য শিল্প কারখানার জন্যে যথেষ্ট। এই তাপের সাহায্যে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে বিদ্যুৎ-ও সৃষ্টি করা যায়।

আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস নাকি অসংখ্য আয়নার সাহায্যে সূর্যের তেজ কেন্দ্রীভূত করে হানাদার রোমান নৌবহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আর তাতে রক্ষা পেয়েছিল সিরাকিউজ। ফরাসী বিজ্ঞানীরা ফ্রান্সের দক্ষিণে সূর্যালোকিত পিরেনিজ পর্বতে দশ বছর ধরে চেষ্টার পর ১৯৬৯ সালে এমনি এক বিরাট সৌরচুল্লি স্থাপন করেছেন। এতে ব্যবহৃত অধিবৃত্ত আকারের আয়না উঁচুতে ১৪০ ফুট ; আর তার সামনে খানিক দূরে সূর্যের দিকে মুখ করে ধাপে ধাপে বসানো ৬৩টি বিশাল সমতল আয়না (তার প্রতিটিতে ১৮০টি আয়নার সমাবেশ)। সবসুদ্ধ মিলে এই ব্যবস্থায় রয়েছে প্রায় ২০,০০০ আয়নার সমাহার ; আর তাতে সূর্যের তাপ অধিবৃত্তের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয়ে তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পারে প্রায় ৩,৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ; এই তাপে দুইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতও দেখতে দেখতে ফুটো হয়ে যায়। এই সৌর ফার্নেসের শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ এক হাজার কিলোওয়াট। একে প্রধানতঃ অতি বিশুদ্ধ ধাতু গলানো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সরাসরি সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক হল গত কয়েক বছরের মধ্যে-উদ্ভাবিত এক ধরনের সৌর-বিদ্যুৎকোষ। আমাদের ভূত্বকে যেসব মৌলিক উপাদান রয়েছে তার মধ্যে অক্সিজেনের পরেই সবচেয়ে সুলভ হল সিলিকন। ভূত্বকের এক-চতুর্থাংশের বেশি এই সিলিকনের পরিমাণ। কিন্তু সিলিকন সব সময় অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে বালির দানার আকারে থাকে, তাই একে বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া খুব শক্ত।

সিলিকন অধাতব বস্তু আর বিদ্যুৎ পরিবহণ করে সামান্য ;—এ ধরনের বস্তুকে বলা হয় অর্ধপরিবাহী (semi-conductor)। সিলিকন এবং এ জাতীয় আরো কয়েকটি বস্তুর ওপর সূর্যকিরণ পড়লে তার পরমাণু থেকে ইলেকট্রন কণিকা ছিটকে বেরিয়ে আসে। এই নীতিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। এজন্যে অতি বিশুদ্ধ সিলিকনের পাতলা পাতের সমাবেশ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রাখলে তা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম ব্যবহারিক সৌরকোষ তৈরি হয় ১৯৫৫ সলের দিকে ; সে সময় বিশুদ্ধ সিলিকন উৎপাদনের প্রযুক্তি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু অতি দুর্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকের শেষে এসব সৌরকোষ মহাকাশ যানে ব্যবহৃত হতে থাকে। আজকাল প্রায় সব মহাকাশ যানেই শক্তির উৎস হিসেবে সৌর প্যানেল ও সৌরকোষ এক অতি অপরিহার্য অঙ্গ। ক্রমে ক্রমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সিলিকন পাতের উৎপাদন ব্যয় কমে এসেছে এবং নানা ধরনের শিল্পপণ্যে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। ষাটের দশকের শেষে মহাকাশযানের সৌরকোষে এক ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি করতে খরচ পড়েছে পাঁচশ' মার্কিন ডলার ; সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সৌরকোষে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ওয়াট প্রতি ব্যয় হত পঞ্চাশ মার্কিন ডলার; আশির দশকের মাঝামাঝি এই ব্যয় কমে পাঁচ ডলারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। আশা করা যাচ্ছে কয়েক বছরের মধ্যে এই ব্যয় ওয়াট প্রতি এক ডলারের মতো বা তারও কম হবে ; তাহলে সৌরবিদ্যুৎ অন্যান্য জ্বালানি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।

বিষুব রেখার উত্তর-দক্ষিণে চল্লিশ অক্ষাংশের মাঝামাঝি এলাকায় বাস করে পৃথিবীর প্রায় আশি শতাংশ লোক। এসব দেশের বেশির ভাগই দরিদ্র, কিন্তু তাদের সূর্যকিরণের সম্পদ রয়েছে অঢেল। এই এলাকায় ভূপৃষ্ঠে গড় সূর্যকিরণের পরিমাণ প্রতি বর্গমিটারে এক কিলোওয়াট। বর্তমান সৌর বিদ্যুৎকোষের দক্ষতা মোটামুটি দশ শতাংশ। অর্থাৎ এক

বর্গমিটার সিলিকন কোষ থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় প্রায় ১০০ ওয়াট (এক বর্গমিটার সিলিকন পাতের দাম প্রায় পাঁচশ' মার্কিন ডলার)। এক বর্গ কিলোমিটার জায়গার সূর্যকিরণ থেকে পাওয়া যাবে ১০০,০০০ কিলোওয়াট বা একশ' মেগাওয়াট। এক হিসেবে দেখা যায় বিলেতের সমগ্র ভূ-ভাগের মাত্র এক শতাংশ জায়গার সূর্যকিরণ থেকে সৌরকোষের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে তাতে সে দেশের সমগ্র বিদ্যুতের চাহিদা মিটবে। মনে রাখতে হবে সমান পরিমাণ জমিতে বিলেতের তুলনায় বাংলাদেশে প্রায় পাঁচগুণ বেশি সূর্যকিরণ পড়ে।

অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সৌরকোষের সুবিধে হল এতে কোন চলন্ত অংশ নেই, যন্ত্রকে চালাবার জন্যে কোন জ্বালানি, কাঁচামাল বা তরল বস্তু প্রবাহের প্রয়োজন হয় না। এ সবের ফলে সৌরকোষের কোন অংশ বিকল হবার ভয় নেই এবং দীর্ঘকাল ধরে নির্ভরযোগ্যভাবে এই কোষ সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে যেতে থাকে। অনেকগুলো ছোট ছোট সৌরকোষকে জোড়া লাগিয়ে বেশি চাপের বা বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। অসুবিধের মধ্যে এই যে, সূর্যকে আকাশে সর্বক্ষণ পাওয়া যায় না ; কাজেই এই শক্তিকে জমিয়ে রাখার একটা ব্যবস্থা দরকার।

সিলিকন সৌরকোষ থেকে শক্তি উৎপাদনের দক্ষতা বাড়াবার চেষ্টা চলছে। পরীক্ষামূলকভাবে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। বিশুদ্ধ সিলিকন উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নত হলে ভবিষ্যতে এর দাম যথেষ্ট কমে যেতে পারে। এছাড়া কেলাসিত সিলিকনের বদলে অকেলাসিত সিলিকন ব্যবহার করে অথবা সিলিকনের বদলে ক্যাড্মিয়াম সালফাইড প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সুলভ উপাদান ব্যবহার করেও সৌরকোষের দাম কমাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আদতে জানালার কাচের পাত যে বালি থেকে তৈরি সেই বালিই সিলিকন সৌরকোষের মূল কাঁচামাল। একদিন হয়তো সিলিকন সৌরকোষের দাম কাচের পাতের মাত্র পাঁচগুণে এসে দাঁড়াবে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে উন্নত দেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে সৌরচুল্লি বা সৌরকোষের ব্যবহার বেশি আকর্ষণীয় হবে। এসব দেশে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে ; গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো ব্যয়সাধ্য। বিশেষ করে বড় লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় শক্তির উৎস হিসেবে সৌরচুল্লি বা সৌরকোষের ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে স্বল্পব্যয়সাধ্য হবে।

পৃথিবীর ওপর কোন জায়গাতেই সূর্যকিরণ দিনরাত সর্বক্ষণ পাওয়া

যায় না। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই পৃথিবীর ২৩,০০০ মাইল ওপরে বিশাল আকারের ভূস্থির সৌরকোষ উপগ্রহ স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। মহাশূন্যে যে কোন ঋতুতে চব্বিশ ঘন্টাই সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। এ রকম উপগ্রহ শক্তিকেন্দ্রে পাশাপাশি ৯ বর্গ মাইল চওড়া দুটি সৌর প্যানেল সমাবেশ থাকতে পারে। সৌরপ্যানেল থেকে যে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে তা একটি অ্যানটেনার মাধ্যমে মাইক্রো-তরঙ্গের আকারে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। পৃথিবীতে বসানো অন্য একটি অ্যানটেনা এই শক্তিকে গ্রহণ করে তাকে আবার বিদ্যুতে পরিণত করবে। এতে তিন হাজার থেকে বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে—অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্তমানে যত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় তার প্রায় দশগুণ।

এ রকম উপগ্রহ সৌরশক্তি কেন্দ্র হয়তো আগামী শতাব্দীতে তৈরি হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন দুনিয়াতে সারা বছর যত শক্তি ব্যবহৃত হয় এই শতকের শেষে তার অন্তত দশ থেকে বিশ শতাংশ আসবে সরাসরি সৌর-শক্তি থেকে।

হিসেব করে দেখা গেছে বাংলাদেশে বর্তমানে যত জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ খনিজ বা অনবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন কেরোসিন, ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা) ; আর বাকি তিন-চতুর্থাংশই চিরাচরিত জ্বালানি—অর্থাৎ কাঠ, পাতা, গোবর, ঘুঁটে, পাটখড়ি, খড়, তুষ ইত্যাদি। আমরা আগেই দেখেছি এসব জ্বালানি আসলে গোড়ায় সালোক-সংশ্লেষের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বন্দী সূর্যেরই শক্তি। খনিজ জ্বালানি যখন আজ পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হবার পথে তখন এই সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দক্ষতা বাড়িয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ কি বাড়ানো যায় না?

সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে সূর্যের শক্তিকে আরো বেশি করে বন্দী করার দিকেও আজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে পাতার ওপর যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পড়ে, পাতা তার ৮০-৮৫ শতাংশ শুষে নিলেও সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে রাসায়নিক শক্তির আকারে জমিয়ে রাখতে পারে সচরাচর মাত্র এক শতাংশ বা তারও কম। কোন কোন জাতের উদ্ভিদে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই হার বেড়ে ৪-৫ শতাংশে ওঠে, কিন্তু তার বেশি কিছুতেই নয়। এই হারকে যদি কোন উপায়ে বাড়ানো যায় তাহলে একাধারে যেমন বাড়বে খেতের ফসল, তেমনি

বাড়বে বন থেকে পাওয়া জ্বালানির পরিমাণ।

সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞানী তিমিরিয়াজেভ একদিন বলেছিলেন ঃ "সবুজ পাতা, বরং তার পত্রহরিতের কণা হল সেই নায়ক যা সূর্যের শক্তি হরণ করে সৃষ্টি করে পৃথিবীর সকল প্রাণ। উদ্ভিদ হল আকাশ আর পৃথিবীর মাঝের দূত। এই সেই সত্যিকার প্রমিথিউস যে স্বর্গ থেকে ছিনিয়ে এনেছে অগ্নিশিখা। উদ্ভিদ সূর্যের যে রশ্মি শুষে নেয় তাই জন্ম দেয় অগ্নিকুণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গার অথবা বিদ্যুতের চমক লাগানো ঝলক।"

সেই উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা আজ ভাল করে বোঝার চেষ্টা করছেন ; এমন কি কৃত্রিম পত্রহরিৎও সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্ভিদের বংশগতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং নানা ধরনের রশ্মি-পাত ঘটিয়ে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষের হারকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চলছে। ক্লোরেলা নামে এক জাতের এককোষী শেওলা অতি দ্রুত সূর্যের শক্তিকে বন্দী করতে পারে। তেমনি কেল্‌প্‌ নামে এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদও দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। এসব ধরনের উদ্ভিদ ব্যাপক আকারে চাষ করে, তা থেকে খাদ্য এবং তাপ সংগ্রহের জন্যে বহু দেশে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন। পৃথিবীর উদ্ভিদ সম্পদ যদি বাড়ানো যায় তাহলে সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তি বন্দী করা সম্ভব হবে।

বর্তমানের অতি অদক্ষ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়াতেও উদ্ভিদ প্রতি বছর সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে তা সারা পৃথিবীতে কয়লা থেকে পাওয়া শক্তির চেয়ে একশ' গুণ বেশি। সালোক-সংশ্লেষের রহস্য ভেদ করে তাকে উদ্ভিদের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারলে মানুষ শক্তির এই বিপুল উৎসের ওপর আধিপত্য লাভ করবে।

আরব্যোপন্যাসের রূপকথায় আছে জেলের কুড়িয়ে পাওয়া কলসীর ভেতরকার সেই দৈত্যের কথা। সূর্যের বিপুল শক্তিকে মানুষ আজ তেমনি কলসীতে বন্দী করার পথে এগিয়েছে। আর মানুষের হাতে এ দুর্ধর্ষ দৈত্য আজ তার অনুগত ভৃত্য। বন্দী সূর্যকিরণ সর্বক্ষণ নিয়োজিত মানুষের সেবায়। এই দৈত্যের বিপুল তেজের স্পর্শে দুনিয়ার ঘরে ঘরে আসতে পারে খাদ্যের প্রাচুর্য—আর কাজের জন্যে অফুরন্ত শক্তি।

অন্তর্ভেদী অজানা রশ্মি

০ ০

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় আবিষ্কারটা অকস্মাৎই ঘটেছিল। জার্মানীর উর্জবুর্গ শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিল্‌হেল্‌ম রণ্টগেন অতি হালকা গ্যাস ভরতি কাচের নলের ভেতর দিয়ে উচ্চচাপ বিদ্যুৎ চলাচল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ১৮৯৫ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে রণ্টগেন বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন এই নলের কাছে রাখা প্রতিপ্রভ মশলা মাখানো কাগজ রহস্য-জনকভাবে আলোকিত হয়ে উঠছে।

নল আর প্রতিপ্রভ পরদার মাঝখানে অস্বচ্ছ বস্তু রাখা হল ; তবু উজ্জ্বল হয়ে উঠল পরদা। আরো ঘন অস্বচ্ছ বস্তু (সীসে) রেখে দেখা গেল পরদায় ফুটে উঠছে তার ছায়া। এবার নলকে ঢেকে দেয়া হল কাল রঙের অস্বচ্ছ কার্ডবোর্ড দিয়ে ; তাতেও প্রতিপ্রভ পরদা আলোকিত হল যেন এক আশ্চর্য অদৃশ্য রশ্মিতে।

নলের সামনে রন্টগেন এর পর রাখলেন নিজের হাত। দেখলেন হাতের চামড়া ফুঁড়ে পরদার ওপর ফুটে উঠল ভেতরকার হাড়ের ছবি। প্রতিপ্রভ পরদার জায়গায় ফটোর প্লেট রেখে তিনি নিলেন কংকালময় হাতের স্থায়ী আলোকচিত্র। রণ্টগেন তাঁর আবিষ্কৃত অজানা নতুন রশ্মির নামকরণ করলেন এক্স-রে বা অজানা-রশ্মি। কখনো আমরা একে বলি রণ্টগেন-রশ্মি কখনো বা রঞ্জন-রশ্মি।

বস্তুর বাধা অতিক্রম করে তার অন্তরলোকের রহস্য ভেদ করার আশ্চর্য শক্তি এই রশ্মির। এত দিন যা ছিল মানুষের দৃষ্টির অগোচরে, দুর্ভেদ্য দেয়াল দিয়ে ঘেরা, তা যেন জাদুমন্ত্রে এক মুহূর্তে হয়ে উঠল দৃশ্য ; মানুষের চোখের সামনে থেকে সরে গেল এক বিরাট বাধা।

এই আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যেই যেদিন জার্মানীর উর্জবুর্গ শহরে বসে রণ্টগেন এই রশ্মি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন তার তিন দিন পরেই সুদূর ভিয়েনার এক ডাক্তার তাকে ব্যবহার করলেন চিকিৎসার কাজে। ভাঙা

হাতের এক্স-রে ছবি তুলে তিনি দেখলেন হাতের হাড় কোথায় কিভাবে ভেঙেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের আর কোন আবিষ্কার এত তাড়াতাড়ি মানব-কল্যাণের কাজে লেগেছে, এমন শোনা যায়নি। নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের প্রথম বছরেই ১৯০১ সালে রণ্টগেন তাঁর এই আবিষ্কারের জন্যে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

ক্রমে ক্রমে যতই ধরা পড়ল এই রশ্মি শুধু চামড়া আর মাংস নয়—কাগজ, কাঠ, পাতলা ধাতুর পাত সব কিছুকেই ভেদ করে যেতে পারে, ততই এর ব্যবহার চিকিৎসার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল শিল্পের ক্ষেত্রেও। নানা রকম ধাতব যন্ত্রপাতির এক্স-রে ছবি তুলে যন্ত্রটাকে না ভেঙেও বোঝা গেল তার মধ্যে কোন খুঁত রয়েছে কিনা, কিংবা জোড়া-লাগানো ধাতব অংশের ভেতরে ঠিক ঠিক মতো জোড়া মিলেছে কিনা। আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার যুগে এই জিনিসগুলো খুবই জরুরী। এরোপ্লেন প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য যন্ত্রে এমন সব জটিল অংশ থাকে যেগুলোকে বাইরে থেকে পরীক্ষা করার কোন উপায় নেই, অথচ ভেতরে সামান্য খুঁত থাকলেও যে-কোন মুহূর্তে সমস্ত যন্ত্রটাই বিকল হয়ে গিয়ে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটবার ভয়। এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্যে রঞ্জনরশ্মিই হচ্ছে প্রধান ভরসা।

তবু বিশ্বলোকের রহস্যসন্ধানী, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বিজ্ঞানীর কাছে রঞ্জন-রশ্মির সব চেয়ে বড় অবদানঃ এই অদৃশ্য রশ্মি মানুষকে শুধু তার শরীরের ভেতর নয়, সমগ্র বস্তু জগতের অন্তর্লোকে প্রবেশ করার পথ খুলে দিয়েছে। চারপাশে বস্তুজগতের যে বর্ণ আর বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখে আমরা মুগ্ধ হই, এ নিতান্তই প্রকৃতির বাইরের রূপ। বাইরে থেকে প্রকৃতির কতটাই বা আমরা দেখতে পাই! আমাদের দৃষ্টিপথের অগোচরে বস্তুর আরো কি কোন অদৃশ্য রূপ রয়েছে? রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা অন্তর্লোকের সেই অদৃশ্য জগতের সন্ধান পেয়েছেন। বস্তুর সে অন্তর্জগৎ শুধু ছন্দে আর বৈচিত্র্যে অপরূপ নয়, মানুষের সামনে বিশ্ব-লোকের জ্ঞানের এক বিপুল ভাণ্ডারকে খুলে দিয়েছে।

লিউয়েনহুক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে আমাদের দৃশ্যজগতের সীমানাকে একদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দৃষ্টির আড়ালে অনেক বস্তুকে করে তুলেছিলেন দৃষ্টিগোচর। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর হলেও বস্তুর অণু-পরমাণুর জগতে তার প্রবেশাধিকার নেই। একমাত্র রঞ্জন-রশ্মিই পেরেছে মানুষকে সেই জগতে ঢুকবার ছাড়পত্র দিতে।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন বাইরের বস্তুজগতে আমরা যা কিছু দেখি, চেয়ার-টেবিল, আলু-পটল থেকে মায় আমাদের শরীর পর্যন্ত, তার সবই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। কঠিন পদার্থের অণু-পরমাণুগুলো প্রায় একে আরেকটার গায়ে গায়ে লাগানো, আঁটসাঁট হয়ে বুনট বাঁধা, যার যার জায়গা থেকে সহজে নড়ে না। তরল পদার্থের বাঁধুনি বেশ ঢিলেঢালা, গ্যাসের বেলা একেবারেই আলগা। কিন্তু কঠিন পদার্থের অণু-পরমাণুগুলো ঠাসা-ঠাসি হলেও এলোমেলো বিশৃঙ্খল নয়। যে যেখানে যেমনভাবে খুশি ঠেলাঠেলি করে দলা পাকিয়ে নেই—সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মতোই তাদের রয়েছে অপূর্ব-শৃঙ্খলা।

নুন, চিনি বা ফিটকিরি পানিতে গুলে শুকোলে যে দানা দানা হয়ে জমাট বাঁধে এ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। এই দানাগুলো কিন্তু যে যার খুশিমতো এক একটা এক এক চেহারা নেয় না। ছোট বড় হলেও একই জিনিসের দানার আকার হয় একই রকমের, তার ধারের সংখ্যা থাকে নির্দিষ্ট। এমনি দানাদার গড়নের বৈজ্ঞানিক নাম দেয়া হয়েছে 'কেলাস'। কেলাসের মধ্যে অণু-পরমাণুগুলো একটা নির্দিষ্ট ছাঁদে বা ছকে সাজানো থাকে বলেই এদের বাইরের আকার হয় পালিশ করা হীরের মতো ; এমন চমৎকার জ্যামিতিক নিয়মে ধার-কাটা একই গড়নের। নানান জিনিসের কেলাসে এই পরমাণু সাজানোর ছক হয় নানান রকমের। তাই এক এক জিনিসের কেলাসও হয় এক এক গড়নের।

বাইরের সমস্ত খনিজ বা ধাতব জিনিসই এমনি ছোট ছোট কেলাস দিয়ে তৈরি। অনেক জিনিসের বেলাতে এই সব দানাদার গড়ন খালি চোখেই স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু যেখানে খালি চোখে জিনিসটাকে হয়তো মাটির ঢেলার মতো বিশৃঙ্খল পিণ্ড বলে মনে হচ্ছে, সেখানেও অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তার মধ্যে ধরা পড়বে ছোট ছোট কেলাসের দানা। পাহাড়ের পাথর, বালি, মাটি, রং, পাউডার থেকে সমস্ত রকমের রাসায়নিক দ্রব্য, ইস্পাত, কংক্রিট, হাড় বা দাঁত পর্যন্ত সব কিছুই এমনি ছোট ছোট কেলাস দিয়ে তৈরি। এমন কি শুনতে কিছুটা অদ্ভুত শোনালেও পরী-ক্ষায় দেখা গিয়েছে কাঠ, সিল্ক, পাট, তুলা, পশম, চুল এসব জিনিসও আংশিকভাবে কেলাস-প্রকৃতির।

আসলে সাধারণ তাপে কেলাস অবস্থাই হচ্ছে বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা। অণু-পরমাণুগুলো সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট ছাঁদ এবং বাঁধুনিতে জড়ো হবার চেষ্টা করে, আর এই ছাঁদ আর বাঁধুনির ওপরেই নির্ভর করে

তার প্রকৃতি। অস্বাভাবিক অবস্থায় (যেমন অতিরিক্ত তাপে) এই ছাঁদ বা বাঁধুনি ভেঙে পড়ে, আর তখন বস্তুর প্রকৃতি যায় বদলে।

ধরা যাক, হীরে, গ্রাফাইট (যা দিয়ে পেন্সিলের শিষ তৈরি হয়) আর কয়লা—এই তিনটে জিনিসের কথা। রসায়নবিদরা তাঁদের হরেক রকমের পরীক্ষা থেকে বললেন, এ তিনটে আসলে একই জিনিস, একই মৌলিক উপাদান 'কারবন' থেকে তৈরি। কিন্তু তাহলে হীরে, গ্রাফাইট আর কয়লার প্রকৃতিতে এমন আকাশ-পাতাল তফাত ঘটছে কি করে? রসায়নবিদরা তাঁদের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পরীক্ষা থেকে কিছুতেই ব্যাপারটাকে বোঝাতে পারেন না। অবশেষে এই রহস্যের সমাধান করল কেলাস-তত্ত্ব। রঞ্জন-রশ্মির পরীক্ষায় ধরা পড়ল, এদের তিনের কেলাস-গড়ন তিন রকমের। আর তাদের মধ্যে কারবন পরমাণুর বিন্যাস-ব্যবস্থার তফাতই এদের প্রকৃতিতেও এমন বিভিন্নতা ঘটিয়েছে। অবশ্য প্রচণ্ড রকমের তাপে সবই একাকার করে দেয়। কয়লা-গ্রাফাইট দূরের কথা, এমন শক্ত যে হীরে তারও কেলাসের বাঁধুনি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—কারবন পরমাণুগুলো খুলে গিয়ে মেশে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আমাদের চোখের পরদায় দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে যে আলো, তার মতোই রঞ্জন-রশ্মিও এক রকমের তরঙ্গ, তবে সে তরঙ্গ মাপে এত ছোট আর এমন তেজী যে, খালি চোখে তাকে দেখার কোন উপায় নেই।

আসলে সাধারণ আলো আর রঞ্জন-রশ্মি দুই-এরই উৎপত্তি বস্তুর পরমাণুর চাঞ্চল্য থেকে। রঞ্জন-রশ্মি সৃষ্টি হয় খুব হালকা গ্যাসপূর্ণ কাচনলের ভেতর অতি উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহ কোন ধাতব লক্ষ্যের ওপর পড়লে। বিদ্যুৎ কণিকা অতি বেগে ধাতব লক্ষ্য বস্তুতে পড়ে তার পরমাণুতে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটানোতেই এই রশ্মির উদ্ভব ; তার ফলে এর তেজ সাধারণ আলোর তুলনায় অনেক বেশি, আর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ দৃশ্য আলোর তুলনায় অনেক ছোট।

রঞ্জন-রশ্মির আবিষ্কার না হলে কেলাস-তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারত না, পদার্থের অন্তর্লোকের খবর পাওয়ারও আর কোন উপায় ছিল না। কেননা কেলাসের ছক বাঁধা পরমাণু-সমাবেশে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে দূরত্ব—এক ইঞ্চির দশ কোটি ভাগের এক ভাগ—তা সাধারণ দৃশ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের

মোটামুটি বিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই সাধারণ আলোর পক্ষে এই সূক্ষ্ম পরমাণু-জাল ভেদ করে বেরোবার কোন পথ নেই। রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তুলনায় অতি ছোট ঃ শুধু ছোট নয়, কেলাসের পরমাণু-জালের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ফাঁক, তার চেয়েও কিছুটা ছোট মাপের। কাজেই রঞ্জন-রশ্মির পক্ষেই কেবল কেলাসের পরমাণু-জালের ফাঁক গলিয়ে ফটোগ্রাফির প্লেটে তার পরমাণু বিন্যাসের ছায়া ফেলা সম্ভব, আর কোন সাধারণ আলোর পক্ষে নয়।

১৯১২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফন লাউএ (Von Laue), ফ্রিডরিশ (Friedrich) এবং নিপিং (Knipping) কেলাসের ভেতর দিয়ে সরু অথচ তেজী রঞ্জন-রশ্মি পাঠিয়ে প্রথম যে আলোকচিত্র পেলেন তাতেই ধরা দিল কেলাসের ভেতরকার পরমাণু সন্নিবেশের এই নিবিড় শৃঙ্খলা। ফটোর প্লেটে একটি ছোট কেন্দ্র-বিন্দুর চারপাশ ঘিরে এমন ভাবে উপবৃত্তের আকারে সাজানো আশ্চর্য প্রতিসম কাল কাল দাগ পড়ল যেন কোন নিপুণ শিল্পী এমনি নক্সার আকারে ওগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছে। কেলাসের নানান অবস্থায় ছবি নিয়ে এই নক্সার পরিবর্তন দেখা গেল। তাই থেকে বিজ্ঞানীদের পক্ষে কেলাসের ভেতরকার পরমাণু সমাবেশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল।

কেলাসের ভেতর দিয়ে রঞ্জন-রশ্মির ছায়াপাতের কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। সে সব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা চলে যে, এই আলোকচিত্রের নক্সা থেকে শুধু যে পরমাণু সমাবেশের শৃঙ্খলার কথাই জানা গেল তা নয়, জানা গেল কেলাসের পারমাণবিক গড়ন, বিভিন্ন অবস্থায় তার পরিবর্তন ; আর বস্তুর প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে আরো অনেক নতুন খবর। এই আবিষ্কারের জন্যে ফন লাউএ ১৯১৪ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন। উদ্ভব ঘটল রঞ্জন-রশ্মি ভিত্তিক কেলাস বিশ্লেষণ পদ্ধতির।

গত কয়েক দশকে ব্র্যাগ পিতাপুত্র (W. H. Bragg ও W. L. Bragg), ডিবাই-শেরার (Debye-Scherrer), মোজলে (Moseley), বার্নাল (J. D. Bernal) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সাধনায় কেলাস-তত্ত্ব আজ এক বিরাট বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আর শুধু বিভিন্ন ধরনের কেলাসের গড়ন জানাই নয়, রঞ্জন-রশ্মির পরীক্ষার সাহায্যে নানা রকম ধাতব ও রাসায়নিক উপাদানের গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটানো, নতুন নতুন উপাদানের সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে। তাই নিতান্ত তত্ত্বগত গবেষণার বাইরেও ধাতব ও রাসায়নিক

শিল্পে কেলাস-তত্ত্ব আজ এক অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকে ব্রিটিশ মহিলা বিজ্ঞানী মিসেস ডরোথি হজকিন (Hodgkin) এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করেন কতকগুলো জৈব অণু যাদের গড়ন রীতিমত জটিল। তার মধ্যে পড়ে ভিটামিন বি-১২, পেনিসিলিন আর ইনসুলিন। তাঁর গবেষণার মাধ্যমে এসবের আণবিক গড়ন উদ্ধার করা সম্ভব হয় ; আর তার ফলে সম্ভব হয়ে ওঠে কৃত্রিম উপায়ে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে এগুলোর উৎপাদন। এসব গবেষণার জন্যে তিনি ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান রসায়নবিদ্যায়।

১৯৭৯ সালে মার্কিন পদার্থবিদ অ্যালান করম্যাক আর ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার গড্‌ফ্রে হাউন্সফিল্ড একযোগে শরীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ; সেও রঞ্জন-রশ্মির প্রয়োগ সম্পর্কিত উদ্ভাবনের জন্যে। সাধারণ রঞ্জন-রশ্মির ছবিতে দেহের ভেতরকার নরম অংশের ছবি ফুটে ওঠে না ; তাছাড়া এতে লক্ষ্যবস্তুর চতুর্দিকের ত্রিমাত্রিক ছবিও ওঠে না। এঁরা এক নতুন ধরনের বলয় আকারের রঞ্জন-রশ্মির উৎস ব্যবহার করে এসব অসুবিধে কাটিয়ে উঠেছেন।

এই নতুন ব্যবস্থায় বলয় উৎসের চারপাশ থেকে হাজার হাজার সূক্ষ্ম রঞ্জন-রশ্মি এসে পড়ে লক্ষ্যবস্তুর ওপর ; তারপর তাকে ভেদ করে অন্য পাশে সংবেদী গ্রাহক-বিন্দুতে সৃষ্টি করে সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ স্পন্দন। এই অসংখ্য বিদ্যুৎ স্পন্দনকে কম্‌পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে পরিণত করা হয় ভেতরকার কোমল দেহকলার আশ্চর্য নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবিতে। বিভিন্ন দেহকোষের ঘনত্ব অনুযায়ী শোষণের ফলে রঞ্জন-রশ্মির ওপর যে সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে তা ইলেকট্রনিক উপায়ে ছবিতে ফুটে ওঠে নানা রঙের কম-বেশি ঘনত্বে।

অবশ্যই রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে বস্তুর অন্তর্লোকের যে রহস্য আজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাকে দু'রকমভাবে দেখা চলে। কেউ কেউ হয়তো এর বিস্ময়কর ছন্দ আর বৈচিত্র্যে, শৃঙ্খলা আর প্রতিসাম্যে মুগ্ধ হয়ে এই নশ্বর বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে উঠে চোখে এক অলৌকিক কল্পজগতের অঞ্জন পরতে চাইবেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হিসেবী মানুষ, শুধু কল্পনার পাখনা মেলে বিজ্ঞানের কাজ চলে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চেষ্টা, কি করে বস্তুর অন্তর্জগতের এই বিচিত্র জ্ঞানকে মানুষের জীবনের প্রয়োজনে

নিযুক্ত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির রহস্যালোকের জ্ঞান আমাদের যত বেশি করে আয়ত্ত হবে, তত বেশি আমরা মানুষের স্বার্থে প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানোর কাজে সাফল্য লাভ করতে পারব। বিজ্ঞানের সাধনার সার্থকতা এখানেই ; যুগে যুগে যত বিজ্ঞানসাধক মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আনবার জন্যে তাঁদের নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের অপরিমেয় আনন্দের উৎসও এইখানে।

নিঃশব্দ শব্দঢেউ-এর জাদু

০ ০

কথায় বলে, তেলে-জলে মিশ খায় না। কিন্তু সত্যি সত্যি কখনোই মিশ খায় না কি? সচরাচর হয়তো খায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে কী না হয়। তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে বাঘে-গরুতে নাকি এক ঘাটে পানি খায়। এ যুগের বিজ্ঞানীদের পক্ষে তেলে-জলে মিশ খাওয়ানো এমন কি আর শক্ত হবে?

সত্যি সত্যি নিঃশব্দ শব্দ-ঢেউ-এর জাদুতে তেলে-জলেও মিশ খাচ্ছে আজকাল অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা সব ঘটাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জন্তু-জানোয়ারের চামড়া না ফুঁড়েও দিব্যি অস্ত্রোপচার চলছে। মগজের কোন শিরা ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হলে তা জানতে পারছেন তাঁরা নিমেষের মধ্যে। হীরের মতো কঠিন বস্তুর ভেতরেও ফুঁড়ছেন সূক্ষ্ম ছেঁদা। গভীর সাগরের তলার দৃশ্যের ছবি তুলে নিচ্ছেন সাগরের তলায় না নেমেও।

এ সবই হচ্ছে শুধু শব্দের ঢেউ দিয়ে। কিন্তু যে গবেষণাগারে এত সব ব্যাপার ঘটছে বা এতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে একবার কান পেতে শুনুন। একদম স্তব্ধ-নিঝুম। কোন শব্দই আপনি শুনতে পাবেন না। তার কারণ, এ হল 'নিঃশব্দ শব্দ' বা অতিশব্দ ; ইংরেজীতে একে বলে আলট্রাসোনিক্স (ultrasonics)। কথাটা চালু হয়েছে তেমন বেশি দিন হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই একে নিয়ে আশ্চর্য সাড়া জেগেছে বিজ্ঞানী-দের মধ্যে।

আলট্রাসোনিক্সের ব্যবহার চমকপ্রদ হলেও এর গোড়ার ব্যাপারটা তেমন জটিল কিছু নয়। শব্দ যে বাতাসের ঢেউ, এ আর কে না জানে? আবার শব্দ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি। বাতাস, পানি বা আর কোন জিনিস তাড়াতাড়ি কাঁপতে থাকলেই শব্দের সৃষ্টি হয়। আর তা ঢেউ-এর আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ; এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। মানুষের

গলার স্বর এক ধরনের শব্দ, গলার স্বরযন্ত্রের কাঁপুনি থেকে এর জন্ম। তেমনি শব্দের সৃষ্টি হয় ঢোলের পরদা বা বেহালার তারের কাঁপুনি থেকে।

হাওয়ায় ভর করে কোন শব্দের ঢেউ যখন কানের পরদায় এসে আঘাত করে, তখন সেই পরদাটাও ঢেউ-এর সাথে সাথে কাঁপতে থাকে। তাই থেকেই আমরা মগজে শব্দের অস্তিত্ব টের পাই। তবে মানুষের কানের পরদা এমনভাবে তৈরি যে, সেকেন্ডে মোটামুটি ২০ বার থেকে ২০,০০০ বার পর্যন্ত কাঁপুনি হলেই মানুষের কান তা শুনতে পায়। এর চাইতে বেশি কাঁপুনিওয়ালা শব্দ মানুষের শোনার এলাকার বাইরে। এদেরকেই এক কথায় বলা হয় আলট্রাসোনিক্স বা অতিশব্দ।

এখানে একটা কথা। এই জাতের আরেকটা শব্দ আজকাল চালু হয়েছে, সে হল সুপারসোনিক্স (supersonics)। দুটো একেবারে আলাদা ব্যাপার, এদের একসাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। হাওয়ার শব্দের কাঁপুনির সংখ্যা যতই হোক, সমুদ্র সমতলে সব শব্দেরই বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৭৬০ মাইল। এর চাইতে বেশি বেগ হলেই তাকে বলা হয় সুপারসোনিক্স বা শব্দোত্তর বেগ। যেমন আজকাল শব্দের চেয়ে দু'গুণ বা তিন গুণ বেগসম্পন্ন সুপারসোনিক এরোপ্লেন তৈরি হয়েছে। কাজেই সুপারসোনিক্স হল শব্দের চেয়ে বেশি বেগ। আর আলট্রাসোনিক্স হচ্ছে শব্দের চাইতে বেশি স্পন্দনের সূক্ষ্ম ঢেউ।

সাগরের পানির ঢেউ-এর সাথে শব্দের ঢেউ-এর তুলনা করা যেতে পারে। এক ঢেউ-এর চূড়া থেকে তার পরের ঢেউ-এর চূড়া পর্যন্ত দূরত্বকে বলা যায় ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। আর কোন জায়গা দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো ঢেউ-এর চূড়া পার হয়ে যাচ্ছে তাকে বলা যায় ঢেউ-এর স্পন্দনসংখ্যা বা কাঁপুনির সংখ্যা। সবচেয়ে মোটা যে শব্দ আমাদের কান শুনতে পায়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল ৬০ ফুট বা তার কাছাকাছি, আর স্পন্দন মোটামুটি সেকেন্ডে ২০ বার। সবচেয়ে তীক্ষ্ণ যে শব্দ আমরা শুনতে পাই, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির কম আর স্পন্দনসংখ্যা সেকেন্ডে ২০,০০০ বারের কাছাকাছি। আজকাল বিজ্ঞানীরা এমন সূক্ষ্ম অতিশব্দ সৃষ্টি করেছেন, যার স্পন্দনসংখ্যা এর চেয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ গুণ বেশি।

অতিশব্দ আমরা কানে শুনতে পাই না বলে দুনিয়াতে কেউই শুনতে পায় না, তা কিন্তু নয়। মানুষ এর ব্যবহার খুব অল্পদিন হল শুরু করলেও বাদুড়রা এর ব্যবহার করছে কয়েক কোটি বছর ধরে। নিকষ কালো অন্ধকার পাহাড়ী গুহায় বাদুড় নির্ঝঞ্ঝাটে উড়ে বেড়ায়, কোন বাধা বিঘ্নের

সাথে তার ধাক্কা লাগে না। সে কিন্তু বাদুড় অন্ধকারে ভাল দেখতে পায় বলে নয়, তার বিশাল স্বরগহ্বর থেকে সূক্ষ্ম অতিশব্দের চিৎকার ছুঁড়ে মেরে। আলোর ঢেউ-এর মতো এই শব্দের ঢেউ যখন ঠিকরে ফিরে এসে তার কানে বাজে, তখন বাদুড় কান দিয়ে বুঝতে পারে পথে কোন বাধা রয়েছে কি-না। বাদুড় ছাড়াও অতিশব্দ শুনতে পায় কুকুর, শুশুক (ডলফিন) আর কোন কোন জাতের পাখি। আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে গ্যালটন নামে এক বিজ্ঞানী এমন ধরনের কুকুরের বাঁশি তৈরি করেন, যার অতিশব্দ মানুষের কানে সাড়া জাগায় না, কিন্তু কুকুর শুনে সাড়া দেয়।

মানুষের শোনার কোঠায় পড়ে যে সব ঢেউ, সেগুলো খুব সাদাসিধে গোছের। সেগুলোর শক্তি কম, আর তা দিয়ে এমন আশ্চর্যজনক ব্যাপারও কিছু করা যায় না। কিন্তু শব্দ মিহি হতে হতে যখন কাঁপুনির সংখ্যা সেকেন্ডে বিশ হাজারের বেশি চলে যায়, তখন কি এমন ব্যাপার ঘটে যে, তা দিয়ে জাদুকাঠির মতো সব অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড সম্ভবপর হয়? উত্তরটা বিজ্ঞানীদের কাছে তেমন কঠিন বা রহস্যজনক কিছু নয়।

বিজ্ঞানের একটা সাধারণ সূত্র এই যে, কোন জিনিসের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে এক সময় তার গুণও যায় বদলে। এই যেমন লোহা। লোহাকে আগুনে তাতাতে আরম্ভ করলে ধীরে ধীরে তা টকটকে লাল হয়ে উঠবে। তাপ আরো বাড়ালে সেই লোহার টুকরোই ক্রমে ক্রমে কমলা, হলদে, সাদা, তারপর সকলের শেষে নীলচে আলো দিতে থাকবে। তাপ বাড়লে এক সময় কঠিন লোহা হয়ে যাবে তরল। আরো বাড়লে তরল লোহা পরিণত হবে বাষ্পে।

কিংবা ধরা যাক নাইট্রোজেন গ্যাসের কথা। আমাদের চারপাশে বাতাসের পাঁচ ভাগের চার ভাগই নাইট্রোজেন গ্যাস। স্বাভাবিক অবস্থায় এটা মোটেই বিষাক্ত নয়—ভারি নিরীহ গ্যাস। কিন্তু হলডেন নামে এক বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখান যে, বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ যদি ক্রমে ক্রমে বাড়ানো যায়, তাহলে সে বাতাসও এক সময় মানুষের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নিয়মটা এই রকম আরো অনেক ব্যাপারেই খাটে।

শব্দের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। শব্দ-ঢেউ-এর কাঁপুনির সংখ্যা বাড়াতে থাকলে এমন একটা সময় আসে, যখন আর কোন শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু যন্ত্র দিয়ে কাঁপুনি বেশ টের পাওয়া যায়। সাধারণ শব্দের ঢেউ

সামান্য শক্ত কোন জিনিসের গায়ে পড়লেই ঠিকরে ফিরে আসে। কিন্তু অতিশব্দের ঢেউ অনায়াসে লোহা, টিন এইসব ধাতুর পাত ভেদ করে চলে যায়।

একটা সাইরেন থেকে এমনি নিঃশব্দ শব্দ-ঢেউ বেরিয়ে আসছে। তার ওপর ধরা হল একখন্ড তুলো। হাতের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু দপ্ করে জ্বলে উঠবে তুলোর টুকরো।

কেমন করে হয় এমন? আগেই বলেছি শব্দের ঢেউ তার সাথে শক্তি বয়ে নেয়। ঢেউ সৃষ্টির সময় তার ভেতর যত বেশি শক্তি ঢুকিয়ে দেয়া যাবে, তাকে মানুষের কাজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে তত সুবিধে। ঢেউ যত বেশি সূক্ষ্ম হবে, কাঁপুনি যত বেশি বার হবে, তার শক্তিও হবে তত বেশি। বলা বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত কম শক্তির অতিশব্দের ব্যবহার এক ধরনের, বেশি শক্তির অতিশব্দের ব্যবহার অন্য ধরনের।

কি করে তৈরি হয় এমনি শক্তিশালী সূক্ষ্ম শব্দ-ঢেউ? —একটা প্রধান উপায় হল বিশেষ ধরনের তড়িৎস্পন্দিত কেলাসের সাহায্যে। স্ফটিক (কোয়ার্জ) এবং এই জাতীয় কোন কোন জিনিসের কেলাসের গুণ এই যে, এর দু'পাশে বিদ্যুতের চাপ সৃষ্টি করলে কেলাসের আকার বদলে যায়। পরিবর্তী বিদ্যুতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক চাপ স্পন্দিত হলে কেলাসটিও অতি দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে। এই স্পন্দন থেকে সৃষ্টি হয় সূক্ষ্ম অতিশব্দ। এমনি স্পন্দিত কেলাসের সাহায্যে আবার অতিশব্দের অস্তিত্বও বোঝা যায়। অতিশব্দ যখন কেলাসের ওপর পড়ে তখন তার গায়ে চাপ পড়ে, তাতে সূক্ষ্ম বিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ বাড়িয়ে নিয়ে কোন কিছু থেকে অতিশব্দের প্রতিফলন পরীক্ষা করা হয়। এই প্রতিফলন টেলিভিশনের মতো একটি পরদার ওপর যে জিনিস থেকে ঢেউগুলো ফিরে আসছে, তার একটা ছবি সৃষ্টি করে।

এমনি করে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির অতিশব্দের প্রতিফলনের সাহায্যে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের পেটে শিশুর মাথা কত বড় হল, মগজের ভেতর টিউমার হয়েছে কিনা, কিংবা হৃৎপিন্ডের কোথাও ত্রুটি দেখা দিয়েছে কিনা। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে হাসপাতালে মগজের ভেতরকার অবস্থা পরীক্ষা করার জন্যে নিয়মিতভাবে অতিশব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এক্স-রের তুলনায় এর একটা বড় সুবিধে এই যে, অতিশব্দ রোগী বা ডাক্তার উভয়ের পক্ষেই সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা ছাড়া শরীরের ভেতরকার কোমল মাংসপেশী ইত্যাদি এক্স-রে-তে ধরা পড়ে না, কিন্তু অতিশব্দের ছবিতে

এগুলোও বোঝা যায়। বৃক্ক বা পিত্তথলি থেকে শল্য চিকিৎসার সাহায্যে পাথর বের করার সময় অতিশব্দের ছবির সাহায্যে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন কোথায় কোথায় পাথর রয়েছে, আর তার সবগুলো বের করা হল কিনা।

প্রথম মহাযুদ্ধে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে থাকা জার্মান ডুবোজাহাজের হদিস পাবার জন্যে মিত্রপক্ষ অতিশব্দের তৈরি 'সোনার' যন্ত্র প্রথম ব্যবহার শুরু করেন। সোনার (Sonar) হল Sound Navigation And Ranging অর্থাৎ "শব্দতরঙ্গের সাহায্যে নৌ-চলাচল ও দূরত্ব নির্ণয়" কথাটার সংক্ষেপ। জাহাজ থেকে ছুঁড়ে শক্তিশালী অতিশব্দের তরঙ্গ পাঠানো হত পানির তলায়। তারপর এই শব্দতরঙ্গ নীচে কোন বস্তুতে বাধা পেয়ে ঠিকরে এলে বোঝা যেত কত দূরে সেই বস্তুটি রয়েছে। এই পদ্ধতিটি আজকাল ব্যাপকভাবে সমুদ্রের তলার মানচিত্র তৈরির জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের তলা মোটেই সমতল নয়, তাতে রয়েছে বিরাট খাদ, পাহাড়-পর্বত, অসংখ্য খাড়াই উংরাই। সোনার-এর সাহায্যে সমুদ্রে মাছের ঝাঁকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অতি সহজে।

শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতির খুঁত বের করার জন্যেও অতিশব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন ধাতু ঢালাই করে যন্ত্রপাতি তৈরির পর তার ভেতর কোন জায়গায় ফাঁক বা ফাটল রইল কিনা সেটা বোঝার জন্যে এর ব্যবহার হচ্ছে। মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন বা রকেটের বিভিন্ন অংশও আজকাল অতিশব্দের সাহায্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এককালে এরোপ্লেনের পাখার ওপর গাদা গাদা বালির বস্তা চাপিয়ে পরীক্ষা করা হত, তৈরির সময় তাতে কোন ফাটল রয়েছে কিনা। কিন্তু মুশকিল হল, এর ফলে নিখুঁত পাখাতেও অতিরিক্ত বালির বস্তার চাপে কখনো কখনো সূক্ষ্ম ফাটল ধরে যেত। পরে প্লেনটি উড়তে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ত। অতিশব্দ ব্যবহার করবার ফলে পরীক্ষার সময়ে যন্ত্রটির ক্ষতি হবার কোন আশঙ্কা নেই। সম্প্রতি একটি পরমাণু-শক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরিতে প্রায় বিশ মাইল লম্বা বিভিন্ন ধরনের ধাতব নল ব্যবহার করতে হয়, তার সবগুলো জোড় অতিশব্দের সাহায্যে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত তেজী অতিশব্দের শক্তি এমন কি নিখুঁতভাবে ধাতু বা প্লাস্টিক ঝালাই করা বা জোড়া লাগাবার জন্যেও ব্যবহার করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্লাস্টিকের মোটরগাড়ি তৈরি হয়েছে, তাতে অতি মজবুত প্লাস্টিকের অংশগুলো নিখুঁতভাবে জোড়া লাগানো হয়েছে জোড়ার জায়গাকে অতিশব্দের সাহায্যে গলিয়ে ফেলে। পারমাণবিক যন্ত্রে অ্যালুমিনিয়াম ও

মরচে-বিহীন ইস্পাতের প্রায় 'অসম্ভব' জোড় লাগানোও সম্ভব হয়েছে এর সাহায্যে। আগামী দিনে গ্রহ-গ্রহান্তরে যাবার জন্যে নভোযান তৈরিতে সম্ভবত এর ব্যবহার আরো বাড়বে।

তেলে-জলে মিশ খাওয়া—এ তো খুব সামান্য ব্যাপার। কি করে খায়? তেলের অণুগুলো পানির অণুর চেয়ে আকারে বড়, কিন্তু ওজনে হালকা। তাই সচরাচর পানির সঙ্গে মেশালে তেলটা ওপরে ভাসতে থাকে। কিন্তু সূক্ষ্ম অতিশব্দের প্রচণ্ড শক্তি তেলের ফোঁটাগুলোকে এত ছোট ছোট কণায় ভাগ করে ফেলে যে, সেগুলো আর পানির অণুকে ঠেলে ওপরে উঠতেই পারে না। তাই তেলে জলে একেবারে মিশে যায়।

অতিশব্দের এই মেশাবার ক্ষমতাটা শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগানো হচ্ছে। নানান রকমের ওষুধপত্র, রাসায়নিক, রঙ, বার্নিশ এসবের বিভিন্ন উপাদান অতিশব্দের ঢেউ দিয়ে সহজেই খুব ভালভাবে মিশিয়ে ফেলা যায়। ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনলে অনেক সময় বোতলের গায়ে লেখা থাকে "খাবার আগে ঝাঁকিয়ে নেবেন"। ভবিষ্যতে হয়তো আর ঝাঁকিয়ে খাওয়ার দরকার হবে না। ডাক্তারখানা থেকেই শব্দের ঢেউ ভালভাবে মিশিয়ে দেবে। এই ঝাঁকিয়ে দেবার দরকার ধোপাখানায় কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার কাজেও। যান্ত্রিক কাপড় ধোবার ব্যবস্থায় অতিশব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে শুরু করেছে। এতে শব্দের ঢেউ পানিকে অতি-দ্রুত কাঁপিয়ে কাপড়ের ময়লাকে তাড়াতাড়ি আলগা করে ফেলে। শিল্পক্ষেত্রে বিরাট বিরাট রকেটের যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে ঘরে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, গহনাগাঁটি বা কৃত্রিম দাঁতের পাটি পরিষ্কার করার জন্যেও অতিশব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে।

বড় ডেয়ারী ফার্ম দুধের জীবাণু নষ্ট (পাস্তুরাইজ) করার জন্যে এবং এর মাখনের কণিকাগুলো ভেঙে দেবার জন্যে শব্দ-ঢেউ-এর যন্ত্র ব্যবহার করছে। এতে দুধ বেশি দিন টাটকা থাকে, আর রোগীদের জন্যে বেশি লঘুপাকও হয়।

কারখানার চিমনিতে ভয়ানক ধোঁয়া হচ্ছে। অতিশব্দের সাইরেন একটা বসিয়ে দিলেই ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হবে। ধোঁয়ার ভেতর যে সব কয়লার গুঁড়ো, ধুলোর কণা ইত্যাদি থাকে, শব্দের ঢেউ সেগুলোকে একসাথে জড়ো করে দলা পাকিয়ে ফেলে ; ধোঁয়া আর চিমনির ওপর উঠতে পারে না।

আরো অদ্ভুত এমন সব ব্যাপার শব্দহীন শব্দ-ঢেউ দিয়ে করা সম্ভব

হচ্ছে যা দেখলে স্রেফ মন্তর ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। যেমন একটা পরীক্ষা: একদিকে একটা পুরু তামার পাতের আড়ালে পেয়ালায় রাখা হল খানিকটা পানি। আরেক দিকে পানি রইল একটা ডিমের খোসার ভেতরে, তাও আবার ডিমের এক দিকটাতে শক্ত খোলস উঠিয়ে ফেলে শুধু পাতলা পরদাটা রাখা হয়েছে। মাঝখানে খুব শক্তিশালী শব্দ-ঢেউ তৈরির একটা যন্ত্র বসানো হল। তেলে ডোবানো স্ফটিক বৈদ্যুতিক শক্তিতে কাঁপছে সেকেন্ডে চার লক্ষবার। এই কাঁপুনি থেকে তৈরি শব্দ-ঢেউ পাঠানো হল সাজানো পানিভরা পাত্র দুটোর দিকে। আশ্চর্য কাণ্ড। তামার পাতের আড়ালে যে পানি ছিল, তা ছিটকে ছত্রখান হয়ে আগ্নেয়গিরির মতো উথলে উঠল, আর ডিমের খোলের ভেতর যে পানি ছিল, তার কিছুই হল না।

গবেষণাগারের সীমানা ডিঙিয়ে মানুষের সাধারণ জীবনে নিঃশব্দ শব্দ ঢেউ-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক বিজ্ঞানের এ এক নতুন বিস্ময়। আর বিজ্ঞানীর চোখে এর ভবিষ্যৎ প্রচুর সম্ভাবনায় উজ্জ্বল।

রেডারের মায়াবী দৃষ্টি

০ ০
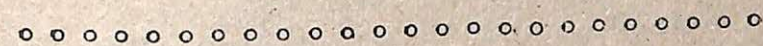
আজকের পৃথিবীতে সারা বছরের প্রতিদিন হাজার হাজার বিমান উড়ছে আকাশে ; সমুদ্র পথে দিনরাত ছুটে চলেছে কয়েক হাজার জাহাজ। আর এর মধ্যে অসংখ্য বিমান উড়ছে বা নামছে প্রবল কুয়াশা, তীব্র বৃষ্টি বা তুষার-পাত উপেক্ষা করে ; জাহাজ চলছে গাঢ় কুজ্ঝটিকা ভেদ করে। তবু এরা সংঘর্ষ না বাধিয়ে, বিপদ না ঘটিয়ে চলাচল করতে পারছে তার কারণ আজকের প্রায় প্রতিটি বিমানে বা জাহাজে বসানো রয়েছে রেডার যন্ত্র। অন্ধকার, কুয়াশা, মেঘ, তুষার বা বৃষ্টির ভেতর দিয়েও রেডার দূরে দেখতে পায় ; এমন কি পাইলট ছাড়া শুধু রেডারের সাহায্যেও বিমান অনায়াসে ওপর-নিচে ওঠানামা করতে পারে বা আকাশে উড়তে পারে।

দূর বঙ্গোপসাগরে যদি লঘুচাপের মেঘ সৃষ্টি হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত সৃষ্টি করে তবে উপকূলে বসানো রেডার সাথে সাথেই তার কথা জানিয়ে দেয় আমাদের আবহাওয়া বিভাগের বিজ্ঞানীদের। রেডারের অব্যর্থ লক্ষ্য-ভেদী চোখ অন্ধকার, কুয়াশা এসব বাধা ভেদ করে দূরের খবর এনে পৌঁছে দেয় মানুষের কাছে।

১৯৬৯ সালে মার্কিন নভোযান অ্যাপলো ১১ নভোচারীদের নিয়ে আলতোভাবে চাঁদের বুকে নামে। তার পরের বছর সোভিয়েত নভোযান লুনা ১৬ আপনা আপনি চাঁদের বুক থেকে মাটি-পাথরের নমুনা খুঁড়ে তুলে নিয়ে আসে পৃথিবীতে। এই দুই নভোযানেরই যাত্রা, চাঁদে অবতরণ, পৃথিবীতে ফিরে আসা সব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বিস্ময়কর রেডারের জাদুদৃষ্টির সাহায্যে।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য আবিষ্কারটি কিন্তু ঘটেছিল মাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। এই যুদ্ধে শত্রুবিমান ও যুদ্ধজাহাজ ঘায়েল করতে একে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছিল।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে হঠাৎ চমক-দেওয়া আক্রমণের ওপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে। এই চমক দেয়ার জন্যে আক্রমণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পরিকল্পনা যাতে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায় সেটা দেখতে হয়; দেখতে হয় নিজের অস্তিত্ব যেন আগাগোড়া সম্পূর্ণ গোপন থাকে। এই রকম অতর্কিত আক্রমণ সব সময়ই যুদ্ধে খুব কাজ দিয়েছে। আগের দিনে গভীর রাতের অন্ধকার বা গাঢ় কুয়াশার সুবিধে নিয়ে সৈন্যবাহিনী শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার জন্যে চুপিসারে এগিয়ে আসত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রেডার মানুষের দৃষ্টির পরিধিকে বহু দূরে বাড়িয়ে দেয়। রেডারকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের 'সবচাইতে বড় গোপন অস্ত্র'। ১৯৪০-৪১ সালের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে যখন জার্মানীর 'লুফ্‌ৎওয়াফা' বিমান দিনরাত ব্রিটেনের ওপর হানা দিয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করছিল, তখন এই গোপন অস্ত্র রেডারই শেষ পর্যন্ত প্রচুর শত্রুবিমান ঘায়েল করতে সাহায্য করে ব্রিটেনকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও প্রায় একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানী রেডার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়।

বেতার তরঙ্গ যে কঠিন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয় এ তথ্য জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎস্ উনিশ শতকের শেষভাগেই (১৮৮৬) জানতে পেরেছিলেন। ১৯২২ সালের দিকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, কিছু দূরে দূরে দুটো জাহাজের একটার ওপর যদি বেতার প্রেরক যন্ত্র আর অন্যটার ওপর বেতার গ্রাহক যন্ত্র থাকে তাহলে এদের মাঝখান দিয়ে অন্য কোন জাহাজ চলে যাবার সময় বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। পরে দেখা গেল প্রেরক আর গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে যে কোন কঠিন বস্তুর প্রতিবন্ধক থাকলেই বেতারের ঢেউ তাতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।

বিশের দশকে প্রায় এই সময়েই জানা যায় পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কতকগুলো আয়নযুক্ত স্তর আছে; এসব স্তর থেকে ছোট মাপের বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। ১৯৩৫ সালের দিকে বিলেতে বার্মিংহাম-শায়ারে রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট এবং আরো ক'জন বিজ্ঞানী এই সব আয়নমন্ডল থেকে বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন সম্পর্কে গবেষণা করছিলেন; তাঁরা দেখতে পান যে, আকাশে বিমান উড়ে গেলে তা থেকেও ছোট মাপের বেতার তরঙ্গ

ঠিকরে ফিরে আসে। এই আবিষ্কারটি কাজে লাগিয়ে ১৯৩৬ সালে ব্রিটেনের উপকূল বরাবর বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রেডার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৪০ সালের দিকে অতিহ্রস্ব শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে দ্রুতগতিতে রেডারের উন্নতি হতে থাকে।

রেডার কথাটার উৎপত্তি হয়েছে Radio Detection And Ranging কথাটাকে সংক্ষেপ করে—অর্থ দাঁড়ায় বেতার তরঙ্গের সাহায্যে অস্তিত্ব ও দূরত্বনির্ণয়। এতে দূরের বস্তুকে দেখা যায় দৃশ্য আলোর পরিবর্তে অদৃশ্য বেতার তরঙ্গের সাহায্যে। আর সে দূরের বস্তুর অবস্থানও জানা যায় আশ্চর্য নিখুঁতভাবে।

রেডারের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতিধ্বনি বা ঢেউ-এর প্রতিফলন। পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ করলে সে শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এখন শব্দ সৃষ্টি আর তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসার মধ্যেকার সময়টা মাপা গেলে তাকে শব্দের বেগ দিয়ে গুণ দিয়ে পাহাড়ের দূরত্বটা সহজেই হিসেব করে বের করা যেতে পারে। হাওয়ায় শব্দের বেগ হচ্ছে ঘণ্টায় প্রায় ৭৬০ মাইল; এই বেগ বিমানের বেগের প্রায় কাছাকাছি। চলন্ত বিমান থেকে শব্দের ঢেউ-এর প্রতিধ্বনি পাবার চেষ্টা করে লাভ নেই; কেননা প্রতিধ্বনি আসতে যতটা সময় লাগবে ততক্ষণে বিমান বহুদূর এগিয়ে যাবে। কাজেই এক্ষেত্রে আরো দ্রুতগতি ঢেউ-এর দরকার। এ রকম ঢেউ হতে পারে আলো অথবা বেতারের ঢেউ—দুইই ছুটে চলে সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বা প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে। কিন্তু আলোক রশ্মির পথ সীমাবদ্ধ; সামান্য কুয়াশা বা মেঘ শুষে নেয় তাকে। তাই এ জন্যে একমাত্র উপযোগী মাধ্যম রইল বেতার তরঙ্গ।

রেডিওতে শব্দ সম্প্রচারের জন্যে যে ঢেউ ব্যবহার করা হয় তার ঢেউগুলো বেশ লম্বা—এক একটা ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েকশ' মিটার পর্যন্ত। রেডারে ব্যবহার করতে হয় খুব ছোট আর শক্তিশালী ঢেউ; এদের দৈর্ঘ্য সাধারণত কয়েক সেণ্টিমিটার থেকে এক মিটারের বেশি হয় না। খুব ছোট বেতারের ঢেউ অনেকটা সার্চ-লাইটের আলোর মতো একদিকে রশ্মির আকারে কেন্দ্রীভূত করে পাঠানো যায়। আসলে এই রশ্মি যত সূক্ষ্ম আর কেন্দ্রীভূত হবে, লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান তত নিখুঁতভাবে জানা যাবে। এই রশ্মি এক সেকেন্ডে চলে তিন লক্ষ কিলোমিটার, অর্থাৎ এক মাইক্রোসেকেন্ডে (অর্থাৎ এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক-

ভাগ সময়ে) চলে ৩০০ মিটার বা মোটামুটি ১০০০ ফুট। ঢেউ লক্ষ্যবস্তুতে পেঁছে আবার ঠিকরে ফিরে আসতে কতটা সময় লাগছে সেটা মেপে লক্ষ্য-বস্তুর দূরত্ব বের করা যায়।

দশ মাইল দূরে বিমান পর্যন্ত গিয়ে আবার রেডার যন্ত্রে ফিরে আসতে এই ঢেউ-এর মাত্র এক সেকেন্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের মতো সময় লাগে। আদতে এই সময় এত কম যে স্টপ-ওয়াচ দিয়ে তা মাপা সম্ভব নয়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ক্যাথোড রশ্মির পরদায় ঠিকরে আসা ঢেউ আপনা আপনি নিজেদের অস্তিত্ব সাদা সাদা দাগ হয়ে জানান দেয়। তার ফলে যে কোন সময় যে কোন রকম আবহাওয়ায় জানতে পারা যায় কোনদিকে কতদূরে বিমান বা জাহাজ বা স্থলভাগ রয়েছে।

রেডারের অতিহ্রস্ব বেতার তরঙ্গ তৈরি করে ছোট ছোট স্পন্দনে বা গুচ্ছে তাকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। শক্তিশালী স্পন্দন সৃষ্টির জন্যে তাতে কয়েক কিলোওয়াট শক্তি সঞ্চার করা প্রয়োজন। আবার এই শক্তিশালী গ্রাহকযন্ত্রের পাশাপাশিই থাকতে হবে অতি মৃদু প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করার ব্যবস্থা। রেডার সৃষ্টির প্রথম দিকে এত শক্তিশালী স্পন্দন সৃষ্টি করে আবার কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যে প্রেরক যন্ত্রকে বন্ধ করা, শক্তি-শালী স্পন্দন পাঠানোর পাশাপাশি একই জায়গায় তার অতি মৃদু প্রতি-ফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করে তাকে বর্ধিত ও দৃশ্যমান করা এবং নিখুঁতভাবে মাইক্রোসেকেন্ডের হিসেবে অতি সূক্ষ্ম সময়ের পরিমাপ—এ সব সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানীরা অল্পকালের মধ্যে এসব কঠিন সমস্যার সমাধান করেন এবং দেশ-রক্ষা, নৌ ও বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে রেডারের ব্যবহার চালু হয়।

ধরা যাক, রেডার থেকে একটি চলন্ত বিমান আছে এক মাইল দূরে। এই দূরত্ব পর্যন্ত বেতারের ঢেউ গিয়ে ঠিকরে ফিরে আসতে সময় লাগে দশ মাইক্রোসেকেন্ড। অর্থাৎ স্পন্দনের সময় দশ মাইক্রোসেকেন্ডের বেশি হলে এই দূরত্বে পাঠানো আর ফেরত আসা ঢেউ-এর মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। অন্যভাবে বলা যায় দশ মাইক্রোসেকেন্ডের স্পন্দন দিয়ে এক মাইলের কম দূরত্বের কোন লক্ষ্যবস্তু দেখা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য বেতারের ঢেউ যত ছোট হবে লক্ষ্যবস্তু দেখতে তত সুবিধে। কিন্তু ছোট অথচ শক্তিশালী ঢেউ সৃষ্টির সমস্যা অনেক।

এবার সমস্যা হল স্পন্দনগুলো কত সময় পর পর ছোঁড়া হবে। ধরা

যাক লক্ষ্যবস্তুর সাধারণ দূরত্ব দশ মাইল। তাহলে স্পন্দন সেই লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আবার ফেরত আসতে সময় লাগবে ১০০ মাইক্রোসেকেণ্ড। একটি স্পন্দন ফেরত আসার পর যদি অন্য স্পন্দন পাঠাতে হয় তাহলে দু'টি স্পন্দনের মধ্যে নিম্নতম সময়ের প্রভেদ রাখতে হয় ১০০ মাইক্রোসেকেণ্ড। এ ধরনের স্পন্দনের প্রতিফলনের সাহায্যে এক থেকে দশ মাইলের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু দেখা চলবে। আদতে রেডারে বেতার তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা হয় সাধারণতঃ সেকেণ্ডে একশ' কোটি থেকে হাজার কোটি আর প্রতি সেকেণ্ডে এমনি গুচ্ছ তরঙ্গের স্পন্দন সৃষ্টি করা হয় দুশ' থেকে দশ হাজার।

রেডারের বেতার তরঙ্গ প্রেরণ আর গ্রহণের জন্যে যে একই অ্যানটেনা বা আকাশ-তার ব্যবহার করা হয় এতে অনেক সুবিধে। দু'টি পৃথক পৃথক অ্যানটেনা ব্যবহার করা হলে তাদের সর্বক্ষণ নিখুঁতভাবে একই দিকে ঘুরিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হত। অবশ্য একই অ্যানটেনা থেকে শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ পাঠানো এবং অতি মৃদু প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণে নানা সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। যে সময়ে শক্তিশালী তরঙ্গ পাঠানো হচ্ছে ঠিক তখনই সেই অ্যানটেনায় একই সাথে মৃদু প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব নয়। এটা শুধু সম্ভব যদি বেতার তরঙ্গ নিরবচ্ছিন্নভাবে না পাঠিয়ে বিচ্ছিন্ন স্পন্দনের আকারে পাঠানো হয়। এতে যখন প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয় তখন প্রেরণ বন্ধ থাকে ; আর যখন বেতার তরঙ্গ পাঠানো হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ বন্ধ থাকে। যে স্বয়ংক্রিয় সুইচ ব্যবস্থার সাহায্যে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় তার নাম হল 'ডুপ্লেক্সার'। এর ফলে ঘটে একই অ্যানটেনার দ্বিমুখী ব্যবহার ; আর এটা সম্ভব হয় বিদ্যুৎগতি ইলেক-ট্রনের সাহায্যে। প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক হাজার বার করে এই সুইচ অ্যানটেনাকে প্রেরক থেকে গ্রাহক আবার গ্রাহক থেকে প্রেরকের সাথে সংযুক্ত করে।

ফেরত আসা তরঙ্গ তার অস্তিত্ব জানান দেয় টেলিভিশনের পরদার মতো একটা ক্যাথোড-রে টিউব বা প্রতিপ্রভ পরদার ওপর সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তরঙ্গ পাঠানো আর ফেরত আসার মধ্যেকার সময়ের হিসেব থেকে এই পরদায় আপনা আপনি লক্ষ্যবস্তুর দূরত্বের হিসেব পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্যবস্তুর সঠিক অবস্থান জানার জন্যে শুধু দূরত্ব জানাই তো যথেষ্ট নয়, তার দিকও জানা দরকার। এজন্যে রেডারে যে অ্যানটেনা ব্যবহার করা হয় সে হল দিক-নির্ভর ; অর্থাৎ এ থেকে যে বেতার তরঙ্গ ছোঁড়া হয় তার বেশির ভাগ ছোটে অ্যানটেনার অক্ষের দিক বরাবর। আবার অক্ষের দিক

থেকে ফেরত আসা তরঙ্গ অ্যানটেনায় সব চেয়ে বেশি সাড়া জাগায়। এই অ্যানটেনাকে যান্ত্রিক ব্যবস্হায় ঘোরাবার ব্যবস্হা থাকে। তার ফলে যে দিকে অ্যানটেনা ঘোরালে বেশি প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে লক্ষ্যবস্তুর দিক পরদার ওপর ফুটে ওঠে। অবশ্য ঘোরানো যাতে অসুবিধেজনক হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্যে অ্যানটেনার আকার যথাসম্ভব ছোট রাখা দরকার ; বেতারের ঢেউ যত ছোট হবে অ্যানটেনার আকারও তত ছোট করা সম্ভব।

লক্ষ্যবস্তু যদি মাটিতে থাকে তাহলে কেবল দূরত্ব আর দিক জানলেই তার অবস্হান বের করা যায়। কিন্তু বিমান বা এমনি আর কোন উড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিফলক পদার্থ দিগন্তের সঙ্গে কত ডিগ্রি কোণ করে আছে তাও জানা দরকার হয়। অ্যানটেনা ঘুরিয়ে এটা জানা যায়। অর্থাৎ রেডার যন্ত্রে অনবরত লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব, দিক আর কোণ নির্ণয় করা হচ্ছে। আমরা যখন কোন একটা বিপজ্জনক শব্দ শুনি তখন শব্দ কান দিয়ে মাথায় ঢোকে আর সাথে সাথে চোখ সেই শব্দের উৎসের দিকে ফেরে ; মস্তিষ্ক কানে শোনা আর চোখে দেখার অনুভূতিকে এক করে। রেডার যন্ত্রেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের সংকেত সমন্বিত করে প্রতিফলক লক্ষ্যবস্তুর সঠিক অবস্হান পরদার ওপর ফুটে ওঠে।

সব রেডারেই যে একই ধরনের ছবি দেখা যায় তা নয়। রেডার রয়েছে নানা জাতের। এদের মধ্যে এক জাতের রেডার হল Plan Position Indicator (PPI) বা অবস্হান নির্দেশক ; এ ধরনের রেডারই জাহাজে বা বিমানে বেশি ব্যবহৃত হয়। বিমান চলবার সময় এতে দীপ্তিমান পরদার ওপর নীচের ভূ-পৃষ্ঠের একটা ছবি ফুটে উঠতে থাকে। নীচের নদনদী, পাহাড়, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট রেডারের পরদায় স্পষ্ট বোঝা যায়। এতে রাতের অন্ধকারে শত্রু এলাকার ওপর গিয়ে বোমা ফেলতে যেমন সুবিধে তেমনি শান্তিকালে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিমান চালাতেও সুবিধে।

যুদ্ধের সময় রেডারের পরদায় বিমান বা জাহাজের ছবি ফুটে উঠলে সমস্যা দেখা দেয় সেটা মিত্রপক্ষের না শত্রুপক্ষের তা জানা। এজন্যে একটা ব্যবস্হা উদ্ভাবন করা হল তার নাম Interrogation, Friend or Foe (IFF) অর্থাৎ 'জবাব দাও—মিত্র না শত্রু'। এতে ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ বেতার সংকেত পাঠানো হয় ; মিত্র বিমান বা জাহাজ হলে সে এক গোপন সংকেত দিয়ে নিজেকে মিত্র বলে জানিয়ে দেয়—এভাবে শত্রু-মিত্র বোঝা সম্ভব হয়।

কোন কোন ধরনের রেডারে গুচ্ছের আকারে বেতার তরঙ্গ না পাঠিয়ে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ পাঠানো হয়। ঠিকরে ফেরত আসা তরঙ্গও নিরবচ্ছিন্নভাবে লক্ষ্যবস্তুর সংকেত দিতে থাকে। রেডার অলটিমিটারে এভাবে বিভিন্ন অবস্থানে বিমানের উচ্চতা নিখুঁতভাবে জানা যায়। রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ বা নভোযানের অবস্থানও এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্রে বা নভোযানে রেডারের সঙ্গে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যুক্ত হয়ে আপনা আপনি তার গতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিমান বন্দরে কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত রেডার ব্যবস্থার সাহায্যে ঘণ্টায় প্রায় একশ'টি করে বিমান ওঠা-নামার ব্যবস্থা আপনা আপনি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

এমনি এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গযুক্ত রেডারকে বলা হয় 'ডপলার রেডার'। এতে দ্রুতবেগে চলন্ত বস্তুর দিকে নির্দিষ্ট মাপের তরঙ্গ ছুঁড়ে দিলে ফেরত আসা তরঙ্গের দৈর্ঘ্যে বা কম্পন-সংখ্যায় কোন পরিবর্তন ঘটলে তা ধরা পড়ে। লক্ষ্যবস্তু যদি কাছে এগিয়ে আসতে থাকে তাহলে প্রতিফলিত তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যা বেড়ে যায় ; আর যদি দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে কম্পন-সংখ্যা কমে যায়। কম্পন-সংখ্যা কি পরিমাণে বেড়েছে বা কমেছে তা থেকে চলন্ত লক্ষ্যবস্তুর বেগ জানা যায়, বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে অবস্থানও জানা যেতে পারে। আজকাল অনেক দেশেই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী এ ধরনের রেডার প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলা হয়েছে।

১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর হাঙ্গেরীর বিজ্ঞানীরা চাঁদের দিকে বেতার তরঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে রেডারে তার প্রতিফলন ধরতে সক্ষম হলেন। এ থেকে চাঁদের আকার এবং উপরিতলের গড়ন আর ধরন সম্বন্ধে নতুন কথা জানা গেল। তারপর ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহ থেকে রেডার প্রতিফলন পেলেন। ১৯৬৩ সালে মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহ থেকেও রেডারের প্রতিধ্বনি ধরা পড়ল। এসব পরীক্ষার ফলাফল চাঁদ, শুক্র আর মঙ্গলের বুকে বিভিন্ন নভোযানের আলতো অবতরণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এ ছাড়া মহাশূন্যে নভোযানের চলাচল নিয়ন্ত্রণে, চাঁদে মঙ্গলে ও শুক্রগ্রহে নভোযানের স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষায় রেডার নানা অভূতপূর্ব কার্যকলাপ সম্পাদন সম্ভব করেছে। পৃথিবীর বাইরে মানুষের অভিযাত্রা যত সুদূরপ্রসারী হবে রেডারের ব্যবহারও তত

বাড়তে থাকবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

•

রেডার মানুষের এক সাম্প্রতিক বিস্ময়কর আবিষ্কার হলেও প্রকৃতিতে বাদুড়রা বহুকাল আগে থেকেই এক ধরনের রেডার ব্যবস্থার সাহায্যে রাতের অন্ধকারে নিরাপদে চলাচল করছে। এ বিষয়ে প্রথম জানতে পান ইতালীর বিজ্ঞানী স্পালান্‌ৎসানি। তিনি ক'টা বাদুড় ধরে তাদের চোখ ভাল করে বেঁধে বাইরে ছেড়ে দেন। চার দিন পর খোঁজ নিয়ে দেখেন তাদের যে গির্জের ভেতর থেকে যোগাড় করেছিলেন তারা বহাল তবিয়তে সেই আস্তানাতেই গিয়ে হাজির হয়েছে। সেই চারটে বাদুড় ধরে তাদের পেট চিরে দেখা গেল চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলেও তাদের উড়তে উড়তে পোকা-মাকড় ধরে ভুরিভোজন করতে কোন অসুবিধেই হয়নি। এরপর বাদুড়দের কানের ফুটো বন্ধ করে দিয়ে তিনি দেখলেন বাদুড় উড়তে গিয়ে কেবলই সব কিছুর সাথে ঠোকর খাচ্ছে। এ জাতের বাদুড়রা কোন শব্দ করে না ; কাজেই সেকালের কেউ স্পালান্‌ৎসানির পরীক্ষার কোন অর্থ খুঁজে পেল না। আদতে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল বিশ্বাসও করল না কেউ।

১৯৩৮ সালের দিকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মানুষের কানে শোনার এলাকার বাইরে অতিশব্দ শব্দতরঙ্গ শোনার উপযোগী ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবন করার পর স্পালান্‌ৎসানির বাদুড় সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। দেখা গেল এসব বাদুড় আপাতদৃষ্টিতে কোন শব্দ না করলেও এরা আসলে মানুষের শোনার সীমানার বাইরে প্রচুর শব্দ সৃষ্টি করছে, আর এই শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যেই তারা অন্ধকারে চলাফেরা করে। এসব বাদুড়ের মুখ বন্ধ করে দিয়ে দেখা গেল তাতে তারা কান বন্ধ করার মতোই ওড়ার সময় একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে আর সব কিছুর সাথে অনবরত ধাক্কা খেতে থাকে।

হাওয়ায় আমরা যে শব্দ করি তার কম্পন-সংখ্যা মোটামুটি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ বার হলেই মানুষের কান তা শুনতে পায় (বয়স্ক লোকের শ্রুতি সচরাচর ১৫,০০০ কম্পন সংখ্যার বেশি যায় না, শিশুরা তার কিছুটা বেশি শোনে)। শব্দের বেগ হাওয়ায় সেকেণ্ডে ৩৪৪ মিটার বা ১১৩০ ফুট ; এক মিলিসেকেণ্ডে (বা এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে) শব্দ ছোটে মোটামুটি এক ফুট—বলা বাহুল্য এই বেগ বেতার তরঙ্গের চাইতে অনেক কম। সেকেণ্ডে বিশ হাজার বার কাঁপুনি

যে শব্দের তার ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য মোটামুটি দেড় সেণ্টিমিটার বা এক ইঞ্চির দুই-তৃতীয়াংশ। স্পষ্টতই এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রেডারে ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গের কাছাকাছি। আর বাদুড় আশেপাশের বাধা-বিপত্তির খবর নেবার জন্যে এমনি ছোট মাপের শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে থাকে। আরো আশ্চর্য এই যে, তারাও এই শব্দ-তরঙ্গ লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছোট ছোট গুচ্ছের আকারে ছুঁড়ে দেয় ; দরকার মতো (যেমন উড়ে উড়ে পোকা-মাকড় শিকারের সময়) ছুঁড়ে দেয়া তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অথবা স্পন্দন-সংখ্যা কমাতে বাড়াতেও পারে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখলেন, উড়তে আরম্ভ করার একটু আগে থেকেই বাদুড় শব্দের সংকেত পাঠাতে শুরু করে ; প্রথমে খুব আস্তে আস্তে—সেকেণ্ডে প্রায় দশ বার করে। তারপর ক্রমে ক্রমে এই হার বাড়ে। বাদুড় যখন স্বাভাবিকভাবে উড়ছে তখন এর শব্দ ছোঁড়ার হার হয় সেকেণ্ডে তিরিশ বার। কিন্তু যেইমাত্র কাছাকাছি কোন কিছু থেকে তার পাঠানো ঢেউ ঠিকরে ফিরে আসে অমনি বিপদের আঁচ পেয়ে বাদুড়ের নিঃশব্দ চিৎকার বেড়ে যায়—হয়ে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে পঞ্চাশ বার। এই রকম ঘন ঘন পাঠানো ঢেউ-এর প্রতিধ্বনি থেকে বাদুড়ের পক্ষে বুঝতে সুবিধে হয় বাধাটা ঠিক কোনখানে রয়েছে। সে তখন সাব-ধান হয়ে ঘুরে যেতে পারে। একটা ঘরে মাত্র এক ফুট দূরে দূরে বসানো সরু তারের জালি রেখে দেখা গেল বাদুড় অনায়াসে সে সব তার এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে। এমনকি প্রতিধ্বনির সমান শক্তির এলোমেলো অতি-শব্দের গোলমাল সৃষ্টি করেও দেখা গেল তাতে বাদুড়ের প্রতিবন্ধক এড়াতে তেমন অসুবিধে হয় না।

রেডারের মতো পদ্ধতিতে পানিতে দ্রুত কম্পনের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রতিধ্বনির সাহায্যে পানির তলার লক্ষ্যবস্তুর হদিস করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার নাম দেয়া হয়েছে 'সোনার' (Sonar : Sound Navigation And Ranging কথার আদ্য অক্ষর নিয়ে তৈরি)। সমুদ্রের পানির তলায় মাছের অবস্থান জানতে বা ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে ব্যাপকভাবে 'সোনার' ব্যবহার করা হয়। শুশুক প্রভৃতি কয়েক ধরনের জলজ প্রাণীও মুখ থেকে দ্রুতকম্পনের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে 'সোনারে'র পদ্ধতিতে পানির নীচে বাধা-বিপত্তির খবর নিতে পারে বা শিকার ধরতে পারে।

মানুষের তৈরি রেডার সাধারণত বেশ বড়সড় আকারের হয়ে থাকে ; কখনো তাতে বিশাল আকারের অ্যানটেনা ব্যবহার করা হয়। এমন কি বিমানে যে ছোট আকারের রেডার ব্যবহৃত হয় তারও আকার কয়েক ঘন ফুট,

ওজন বহু কিলোগ্রাম। সে হিসেবে বাদুড়ের স্বরযন্ত্র, কান আর মগজ মিলে ওজন কখনো কখনো এক গ্রামেরও কম, আয়তন এক ঘন সেণ্টিমিটারও নয়। কিন্তু কয়েক কোটি বছরের বিবর্তনের ভেতর দিয়ে রেডারের পূর্বপুরুষ বাদুড়েরা যে দক্ষতা অর্জন করেছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। বাদুড় ও অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা তাঁদের যন্ত্রকৌশল আরো উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।
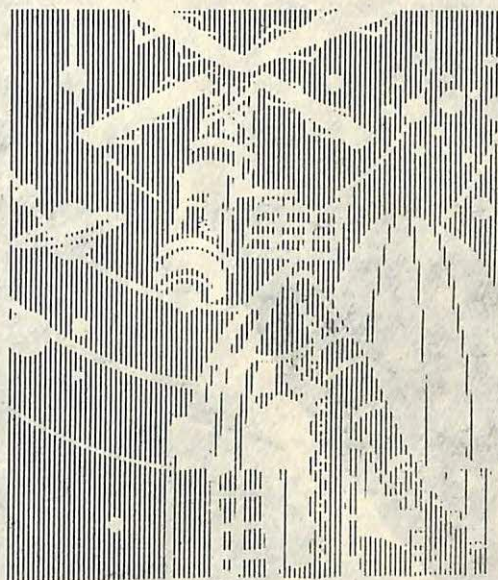
বিশ্বলোক

পৃথিবীর এই সীমাবদ্ধ গণ্ডিই কি মানুষের চিরকালের বিধিলিপি? এযুগের মানুষ গণ্ডিকে মানেনি--- পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে মহাকাশে। সৌরজগৎ এবং তারও ওপারে চলেছে মানুষের অন্বেষণ আর অভিযাত্রা। তার আশ্চর্য মনীষা আজ নিয়োজিত মহাবিশ্বের অনন্ত রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচনে।

স্কাইল্যাব ও মহাকাশ গবেষণা

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
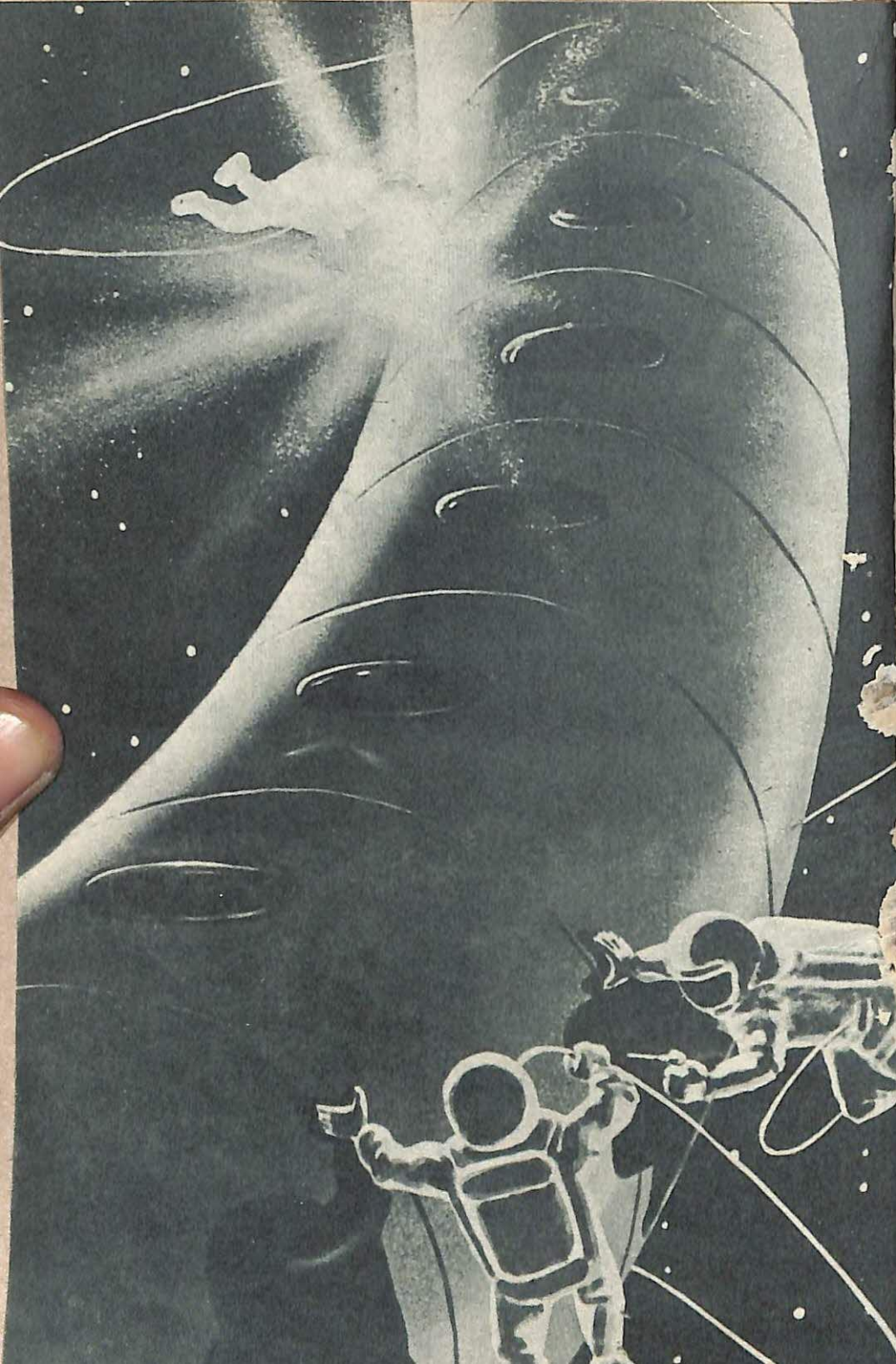
এক বিশাল মহাকাশ গবেষণাগার বিজ্ঞানীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে মূর্তিমান অপদেবতার মত হুড়মুড় করে এসে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। কক্ষচ্যুত স্কাইল্যাবের এমনি খন্ড-বিখন্ড হয়ে মর্ত্যভূমিতে আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯৭৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী নভোচারীরা একে পৃথিবীর কক্ষপথে ত্যাগ করে আসার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা এর আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন।

প্রায় আড়াই হাজার মণ ওজনের এই মহাদানবটির ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ঠিক কবে কোথায় পড়বে একথা আগে থেকে বলা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন, এটা বছরদশেক মহাকাশে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খাবে। কিন্তু নানা কারণে এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল অপ্রত্যাশিতভাবে তার অর্ধেক সময় যেতে না যেতেই। বিজ্ঞানীরা শুধু আগে থেকে বলতে পারলেন, এটা পড়বে জুলাই-এর মাঝামাঝি, ৫০ ডিগ্রি উত্তর থেকে ৫০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে কোন জায়গায়। আর খন্ডের সংখ্যা হবে পাঁচ শ' থেকে হাজার, তার মধ্যে কোন কোনটি হবে চল্লিশ থেকে ষাট মণ ওজনের। এমনি সব বিশাল বস্তুখন্ড দু'শ'-আড়াইশ' মাইল ওপর থেকে পড়া চাট্টিখানি কথা নয়। সারা দুনিয়া জুড়ে দেশে দেশে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল। অবশেষে বিশাল এলাকা জুড়ে দেহভস্ম ছড়িয়ে স্কাইল্যাব পৃথিবীর বুকে নেমে এল ১৯৭৯ সালের ১১ই জুলাই তারিখে।

জানা গেল, স্কাইল্যাবের বেশির ভাগ খন্ড পড়েছে ভারত-মহাসাগরে—উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি জায়গায়। কতক পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি অঞ্চলে। কতক পড়েছে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বিজন এলাকায়। আর কিছু এখানে সেখানে। সৌভাগ্যের কথা, জনবহুল জায়গায় বড় কোন খন্ড পড়েনি, আর এর জন্যে কোনরকম ক্ষতিরও খবর পাওয়া যায়নি। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন মার্কিন মহাশূন্য সংস্থা

'নাসার' কর্তৃপক্ষ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সারা দুনিয়ার মানুষ।

কিন্তু এই স্কাইল্যাবের ঘটনা থেকে নতুন করে সবার দৃষ্টি পড়েছে মহাকাশ গবেষণার দিকে। মহাকাশ গবেষণার যে বিপদের দিক তার নাটকীয় রূপ সারা দুনিয়ার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, গত দুই যুগে প্রায় দশ হাজার রকেট, নভোযান বা এসবের অংশ মানুষ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এর মধ্যে অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার খন্ড ইতিমধ্যে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, তাতে কোথাও কারো কোন বিপদ ঘটেনি। কাজেই আর যে হাজার পাঁচেক বস্তু এখনও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এসব থেকেও বিপদের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কিন্তু তবু আশ্বস্ত হওয়া শক্ত। ছোটখাট বস্তু পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একই অবস্থা ঘটে প্রতিদিন যে কয়েক কোটি উলকাখন্ড মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে তাদের, তবে একেবারে পুড়ে যায় না এমন উল্কাও পৃথিবীতে পড়ে রোজ পাঁচ-সাতটি। আর মাঝে মধ্যে রীতিমত বড় আকারের উল্কার পিন্ড এসে পড়ে পৃথিবীতে। আজ তাদের সাথে যোগ হয়েছে মানুষের তৈরি স্কাইল্যাবের মত বিশাল সব বস্তু। কেন এসব বস্তু মহাশূন্যে পাঠানো? একি শুধুই বিজ্ঞানীদের শখের খেলা, বিপুল অর্থের অপচয়, আর মানুষের জন্যে বিপদ ডেকে আনা?

খরচের কথা যদি তোলা হয়, তাহলে খরচ হচ্ছে বিপুল অঙ্কের তা বলাই বাহুল্য। স্কাইল্যাব মহাশূন্য গবেষণাগারটি তৈরিতে খরচ পড়েছে বিশ কোটি ডলার (প্রায় ছ'শ কোটি টাকা)। সমগ্র স্কাইল্যাব প্রকল্পের খরচ আড়াইশ' কোটি ডলার—বাংলাদেশের প্রায় দু'বছরের মোট বাজেট বরাদ্দের সমান। চাঁদে মানুষ নামানোর জন্যে আমেরিকার যে অ্যাপলো প্রকল্প তাতে খরচ হয়েছিল এর চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি। মার্কিন জনসাধারণও এই বিপুল ব্যয়ের সমালোচনা করেছেন, তার ফলে নাসা-র জন্যে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই বিপুল ব্যয়ের সম্মুখীন হয়ে গোড়া থেকেই চাঁদে মানুষ নামানোর চেষ্টা করেনি। চাঁদ, মঙ্গল বা শুক্র গ্রহ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে তারা প্রধানত নির্ভর করেছে স্বয়ংক্রিয় নভোযানের ওপর। এমন নভোযান যা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করে আপনা আপনি বেতারযোগে তার খবর পাঠায়, খুঁড়ে মাটি পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। মঙ্গল আর শুক্রগ্রহের বেলায় এমনি স্বয়ংক্রিয় যান ব্যবহার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বরং গোড়া থেকেই গুরুত্ব দিয়েছে পৃথিবীর চারপাশে মহাশূন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ওপর। পৃথিবীর চারপাশের মহাশূন্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ আর সে তথ্যকে মানুষের কাজে ব্যবহার করার দিকে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর চারপাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন (৪ অক্টোবর ১৯৫৭) পৃথিবীর চারপাশে কৃত্রিম উপগ্রহে প্রথম মানুষ যাত্রী (ইউরি গাগারিন, ১২ এপ্রিল, ১৯৬১), মহাশূন্যে নভোযানের বাইরে প্রথম শূন্যচারণ (আলেক্সি লিওনভ, ১৮ মার্চ ১৯৬৫) প্রভৃতি ছাড়াও ১৯৭১ সালের জুন মাসে পৃথিবীর কক্ষপথে স্যালুট নামে বিশাল গবেষণাগারের সঙ্গে সয়ুজ নামে নভোযানে চেপে নভোচারীদের যোগ দেবার মাধ্যমে প্রথম বড় রকম মহাকাশ স্টেশনও প্রতিষ্ঠা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

চাঁদে মানুষ নামাবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপলো কর্মসূচী ১৯৭২ সালে শেষ হয়েছে। কিন্তু তার আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মহাকাশ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী হাতে নেয়। চার বছরের প্রস্তুতির পর স্কাইল্যাব মহাশূন্যে ছোঁড়া হয় ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে তারিখে। প্রকল্পটি গোড়াতেই নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। ছোঁড়ার সময় তার ওপরকার একটি অ্যালুমিনিয়াম পাতের আবরণ ছিঁড়ে যায়। ভেঙে পড়ে সৌরকোষের প্যানেলযুক্ত একটি ডানা। অন্য ডানাটিও আটকে যাবার ফলে বেতার সংকেতে সেটা খোলা সম্ভব হয় না। সৌরকোষ অকেজো হওয়ায় স্কাইল্যাবে দেখ দেয় বিদ্যুতের ঘাটতি। শীতাতপ ব্যবস্থার জন্যে যথেষ্ট বিদ্যুৎ না পাওয়ায় তার ভেতরকার তাপমাত্রা বেড়ে ওঠে। ২৫শে মে তারিখে তিন জন নভোচারী যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অ্যাপলো নভোযানে চড়ে এই বিকল স্কাইল্যাবে পৌঁছন। দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা স্কাইল্যাবের ওপর একটি আবরণ লাগাতে আর আটকে পড়া ডানাটি খুলতে সক্ষম হন। এতে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে আসে, আর এই বিকল গবেষণাগারটি চালু করা সম্ভব হয়।

স্কাইল্যাবের প্রথম নভোচারী দল ২৮ দিন, দ্বিতীয় দল ৫৯ দিন আর তৃতীয় দল ৮৫ দিন এই গবেষণাগারে কাটান। তখন পর্যন্ত আর কোন

নভোচারী দল এত দীর্ঘ কাল মহাশূন্যে কাটান নি। স্কাইল্যাবে নভো-চারীদের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদের পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। ছোট অ্যাপলো নভোযানে করে এতে রসদ সরবরাহ সম্ভবও ছিল না। রসদ ফুরিয়ে যাবার পর তৃতীয় দল এটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে আসেন।

ইতিমধ্যে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে স্যালুট ৬-এ সোভিয়েত নভোচারীরা একনাগাড়ে ৯৬ দিন কাটিয়ে স্কাইল্যাবের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ১৯৭৯ সালে আরেক দল নভোচারী স্যালুট ৬-এ প্রায় ছ'মাস একনাগাড়ে কাটিয়ে স্কাইল্যাবের রেকর্ডের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সময় মহাশূন্যে বাস করেছেন। স্যালুট গবেষণাগারে নভোযানে চেপে যেমন নভোচারী আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা আছে তেমনি প্রগ্রেস নামে স্বয়ংক্রিয় নভোযানে মাঝে মাঝে রসদ আর জ্বালানি সরবরাহেরও ব্যবস্থা আছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মহাকাশ জয়ের জন্যে এক বিপুল প্রতিযোগিতা চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৌশলে দুনিয়ার সবচেয়ে অগ্রগামী দু'টি দেশের মধ্যে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা কি শুধুই সামরিক শক্তি বাড়াবার জন্যে? পরস্পরের ওপর নজর রাখার জন্যে? নাকি মহাশূন্যের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে অর্থনীতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

মার্কিন ও সোভিয়েত উভয় পক্ষের বিজ্ঞানীরাই বলছেন, মহাকাশ গবে-ষণার শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে এর মধ্যেই যে অর্থনৈতিক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তা মহাশূন্য বিজয়ের জন্যে এ যাবৎ যে ব্যয় হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। দুনিয়ার আরো বহু দেশ (চীন-ভারত সহ) ক্রমে ক্রমে মহাশূন্য গবেষণায় এগিয়ে আসছে, মহাশূন্য প্রযুক্তির প্রয়োগে অভিজ্ঞতা লাভ করছে, এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করছে। বাংলাদেশেও একটি ছোটখাট মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানত যোগাযোগ, আবহাওয়া আর ভূসম্পদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগেই নিউটন তাঁর গতিবিদ্যার সূত্র থেকে দেখিয়েছিলেন, কোন বস্তুকে যদি সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল (অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল) বেগে কোন উঁচু জায়গা থেকে ভূমির সমান্তরাল করে ছোঁড়া যায় তাহলে সেটা মাটিতে না পড়ে পৃথিবীর চারদিকে কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে। এই অবস্থায় বেগের ফলে সেই বস্তুতে যে কেন্দ্র-বিমুখ শক্তি জন্মায় তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সমান অর্থাৎ বস্তুটি

ওজনহীন অবস্থায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। নিউটন অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, বস্তুটি যদি ভূপৃষ্ঠের বেশি কাছাকাছি অবস্থায় ঘোরে তাহলে ঘন বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘষায় শীগগিরই তার শক্তি ক্ষয় হবে এবং সেটা মাধ্যাকর্ষণের টানে মাটিতে এসে পড়বে। তবে বস্তুটি যদি ছোঁড়া যায় ঘন বায়ুমণ্ডলের ওপর দিয়ে তহলে এই উপগ্রহ দীর্ঘকাল ধরে আপনা আপনি পৃথিবীর চার পাশে ঘুরতে থাকবে।

নিউটনের সময়ে এরকম প্রচণ্ড বেগবান গোলা বা রকেট ছোঁড়া সম্ভব ছিল না। সম্ভব হল এর প্রায় তিনশো বছর পরে। কিন্তু এমনি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠা, তাতে মানুষের অবস্থান এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসা, মহাশূন্য থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বেতার যোগাযোগ, নভোযান থেকে বেরিয়ে নভোচারীদের মহাশূন্যে বিচরণ ; চাঁদ, মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতিতে আলতো অবতরণ, মহাশূন্যে বিভিন্ন নভোযানের সংযোগ এসব আজ মানুষের জন্যে এক নবযুগের সূচনা করেছে। গত দু'যুগের মধ্যে অকস্মাৎ মানুষের আধিপত্যের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে—মহাশূন্যে। পৃথিবীর বাইরের জগতকে আয়ত্ত করার জন্যেও মানুষ হাত বাড়িয়েছে মহাশূন্যের নানা বস্তু আর শক্তি-সম্ভারের দিকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর বাইরের যে সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে তাতে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর অবস্থান মানুষের কাছে নতুন করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক একটি উপগ্রহ প্রায় দেড় ঘণ্টায় (বা উচ্চতা অনুসারে আরো বেশী সময়ে) একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসে। তার কক্ষপথ যায় দুনিয়ার নানা দেশের ওপর দিয়ে। বলাই বাহুল্য, উপগ্রহের সাহায্যে আকাশের ওপর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দুনিয়াজোড়া মেঘের যে বিচিত্র বিপুল সমাবেশ দেখার সুযোগ ঘটল তার কথা আবহবিদরা আগে কল্পনাও করতে পারেননি। এর ফলে সারা দুনিয়ায় আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ে এল অতি সহজ। কোন্ পথে কত দ্রুত উড়ে চলেছে কি পরিমাণ মেঘ, কোথায় আসছে ভয়াল সাইক্লোন, এসব খবর পাওয়া অতি সহজ হয়ে গেল আবহাওয়া উপগ্রহের মাধ্যমে। আর এধরনের বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্যে সাথে সাথে গড়ে উঠতে লাগল বিস্ময়কর স্মরণ শক্তি আর অবিশ্বাস্য দ্রুত গণনাশক্তিযুক্ত সব কম্পিউটার। ঝড় বা সাইক্লোনের আগাম সতর্ক সংকেত নিরাপত্তা দিল বিশাল সমুদ্রে হাজার হাজার জাহাজের চলাচলকে।

এমনিভাবে প্রথম দিকেই কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার শুরু হল বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেলিযোগাযোগের জন্যেও। কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে যত বেশি ওপর দিয়ে শূন্য পরিক্রমণ করে তার কক্ষপথ হয় তত বড়, আর পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে তত বেশি। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ২২,৩০০ মাইল উঁচুতে বিষুবীয় বলয়ের ওপর উপগ্রহ স্থাপন করলে তার কক্ষ পরিক্রমার সময় হয় চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ পৃথিবীর নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে দিন রাতে একবার ঘুরে আসবার সমান। এ অবস্থায় পৃথিবী থেকে মনে হয় উপগ্রহটি একই জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে। এমনি তিন-চারটি উপগ্রহ যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে স্থাপন করা হয় তাহলে তার মাধ্যমে পৃথিবীর বক্রতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পৃথিবীর চারপাশে বেতার যোগাযোগ হয়ে ওঠে অতি সহজ।

মাত্র দু'যুগ আগেও দুনিয়ার এক দেশ থেকে আরেক দেশে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল অতি দুঃসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ ; কখনও কখনও দিনের পর দিন কেটে যেত টেলিফোনের সংযোগ পেতে। অথচ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে দূর দেশের সাথে আজ টেলিফোনে বার্তা বিনিময় হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি সহজ। ঠিক তেমনিভাবে সম্ভব হচ্ছে নানা দেশে একই সাথে টেলি-ভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার। বাংলাদেশেও বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখছি বহু হাজার মাইল দূরে মক্কায় হজের দৃশ্য অথবা মোহাম্মদ আলীর মুষ্টিযুদ্ধ। ভবিষ্যতে বড় বড় যোগাযোগ উপগ্রহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদেশের সাথে টেলিফোন বা টেলি-ভিশন সংযোগের ব্যয় আরো অনেক কমে আসবে। তার ফলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ হবে আরো সহজ।

পৃথিবীর বাইরে এমনি ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের ফলে শুধু যে পৃথিবীর আকাশে মেঘমালার ওপরই নজর রাখা সম্ভব হয়েছে তা নয়, নজর রাখা যাচ্ছে পৃথিবীর ওপরকার আরো অনেক কিছুর ওপরই। বিজ্ঞানীরা জানেন পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু বিশেষ বিশেষ মাপের তরঙ্গের মাধ্যমে তাদের দেহ থেকে রশ্মি বিকিরণ করে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের দেহের রশ্মি বিকিরণ থেকে তাদের পার্থক্য বোঝা যেতে পারে। পানি-মাটি-পাথরের রশ্মি বিকিরণ থেকে বোঝা যায় তাদের প্রকৃতি। এর ফলে তৈরী হয়েছে ভূ-সম্পদ উপগ্রহ। তার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে কতটা ফসল ফলছে তার পরিমাণ, খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা, বনভূমির অবস্থা, সমুদ্রে স্রোতের বৈচিত্র্য, এমনকি মাছের দলের আনাগোনা। কানাডা

বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মত বিশাল দেশে বনভূমির দাবানলের হদিস পাওয়া যাচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে। উপগ্রহের মাধ্যমে খবর নেয়া হচ্ছে বরফাবৃত মেরু অঞ্চলে বা দুর্গম পর্বতে কি হারে বরফ গলছে তার। বাংলাদেশের মত নদীবহুল দেশে সঠিক হদিস করা যাচ্ছে জলভূমির, নজর রাখা হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলে নদনদীর পলিমাটি পড়ে সমুদ্রের বুকে ডাঙ্গা বা চর জাগছে কিনা সেদিকে।

মহাকাশ থেকে শুধু যে পৃথিবীর দিকে নজর রাখাই সহজ হয়েছে তা নয়, সহজ হয়েছে সারা বিশ্বের দিকে নজর রাখাও। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধার ফলে বিজ্ঞানীদের দূরবীণ বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাইরের দুনিয়ার খবর পায় অনেকটা ঝাপসাভাবে, অনেক খবর হারিয়ে যায় বায়ুমণ্ডলের বাধা পেরিয়ে আসতে। সূর্যের নানা উৎক্ষেপের খবর, নক্ষত্রমণ্ডলের নানা রহস্য নভোযানের যন্ত্রপাতি থেকে যেভাবে পাওয়া গিয়েছে এমন আগে আর কখনো পাওয়া যায়নি। চাঁদের বুক থেকে শুধু মার্কিন নভোচারীরা তুলে এনেছেন প্রায় চারশো কিলোগ্রাম (দশ মণের ওপর) ওজনের অন্তত দু'হাজার রকম মাটি-পাথরের নমুনা। এসব পৃথিবী, সৌরজগৎ আর বিশ্বের জন্মরহস্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করছে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় ঃ এসব তো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেও হতে পারে ; মহাকাশে মানুষ যাবার কি সত্যি প্রয়োজন আছে?

বার বার বহু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যন্ত্র দিয়ে সবক্ষেত্রে মানুষের বিকল্প হয় না। মানুষ তার বুদ্ধি আর কৌশলের প্রয়োগে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে মহাশূন্যে বহু দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান করেছে। আর ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে মহাশূন্যের ওজনবিহীন নিতান্ত অনভ্যস্ত পরিবেশেও মানুষ খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মহাশূন্যে বাস করতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে, কাজ করতে পারে ; তারপর নিরাপদে সুস্থ দেহে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে।

গত প্রায় দু'যুগ ধরে মহাকাশ গবেষণার একটা বড় দিক দখল করে থেকেছে এই বিপদসঙ্কুল, অনাত্মীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, তার বিশেষ চরিত্র জেনে তাতে বাস করবার কৌশল আয়ত্ত করা। ১৯৫৭ সালে মহাশূন্যের প্রথম যাত্রী লাইকা থেকে ১৯৬১ সালে গ্যাগারিনে উত্তরণ ছিল মানুষের জন্যে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। কিন্তু তারপর অপ্রতিহতভাবে

মানুষের পদযাত্রায় চিহ্নিত হয়েছে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বের বায়ুহীন জগৎ। বিজ্ঞানীরা এই ওজনহীন অবস্থায় বাস করা সম্বন্ধে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রথম দিকের সেই সংকীর্ণ খুপরি শূন্যযান থেকে সৃষ্টি করেছেন স্যালুট বা স্কাইল্যাবের মত বিশাল মহাশূন্যযান। তাতে স্থাপন করেছেন গোসলখানার শাওয়ার, রান্নাঘর, প্রায় পৃথিবীর মতই খাওয়া-দাওয়া, বাসের ব্যবস্থা। যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণের জন্যে, ছোটখাট মেরামতের জন্যে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত নভোচারীরা অনায়াসে মহাশূন্যে চলমান নভোযানের বাইরে বেরিয়ে কাটাচ্ছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

স্যালুট ও স্কাইল্যাব উভয় নভোযানের নভোচারীরা সম্প্রতি যেসব নতুন ধরনের পরীক্ষা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধাতু ওয়েল্ডিং আর ঝালাই-এর সাহায্যে জোড়া লাগানো। এই পরীক্ষা সফল হবার ফলে মহা-শূন্যে বিভিন্ন ধাতব অংশের সংযোগ ঘটিয়ে বিশাল মহাশূন্যযান তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া তাঁরা মহাশূন্যের ওজনহীনতা আর বায়ু-শূন্যতার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীতে ওজনের বিভিন্নতার ফলে ভালমত মেশানো যায় না এরকম ভিন্ন ধাতু মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন ধরনের সংকরধাতু, উৎপাদন করেছেন অতি বিশুদ্ধ ভ্যাকসিন, আশ্চর্য নিখুঁত আর বড় আকারের কেলাস প্রভৃতি। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে অতি শক্তিশালী সৌরকোষ সৃষ্টি হয়েছে ; নভোযান মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় যে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি হয় তার হাত থেকে নভোচারীদের রক্ষার জন্যে তাপরোধক নতুন রাসায়নিক উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে ; এমনি বহু প্রযুক্তি কৌশল ইতিমধ্যেই সাধারণ ব্যব-হারের জন্যে বাজারজাত হচ্ছে। নতুন উদ্ভাবিত অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বহু ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, নতুন নতুন যন্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপুল পরিবর্তন এনেছে।

মহাকাশ গবেষণা আজ শুধু দুনিয়ার দু'চারটি শক্তিধর দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ১৯৭৫ সালে সয়ুজ-অ্যাপলো সংযোগ শুধু দু'টি দেশের নভোযান সংযুক্ত করে মহাশূন্যে বিপদগ্রস্ত নভোযান উদ্ধারের সম্ভাবনা প্রসারিত করেনি, মহাশূন্য গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করেছে। স্যালুট নভোযানে নানা দেশের নভোচারীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। মার্কিন শাট্‌ল্‌ আকাশ ফেরী আকাশে ওঠা-নামা শুরু করেছে।

এসব নভোযানে বহু দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষার যন্ত্রপাতি (কোন কোন ক্ষেত্রে যাত্রীসহ) পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জোড়া লাগিয়ে মহাশূন্যে বিশাল মহাকাশ স্টেশন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সেখানে যে শুধু পৃথিবী আর মহাকাশ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে তাই নয়, পৃথিবীতে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এমন সব ধাতু এবং অন্যান্য বস্তু উৎপাদন করার জন্যেও এসব স্টেশন কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বিশাল আকারের স্টেশন হয়ত সৌরশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে পৃথিবীতে পাঠাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে।

বিস্তারিত পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যে-কোন সুস্থ ব্যক্তি সামান্য প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম সম্পর্কিত কতকগুলো নিয়ম মেনে চললে মহাকাশে এক সপ্তাহ থেকে এক মাস সময় অনায়াসে কাটাতে পারে। কাজেই মনে হয় সাধারণ যাত্রীবাহী মহাকাশযান এই শতকের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হবে। কয়েক শ', এমনকি কয়েক হাজার লোকের বসতি হবে এমন মহাশূন্য স্টেশন প্রতিষ্ঠাও আজ আর সুদূরের কল্পনা বলে মনে হয় না।

পৃথিবীর বাইরে রয়েছে সূর্যের অঢেল শক্তি আর সৌরজগতের প্রচুর বস্তুসম্পদ। হয়ত আগামী শতকে মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশের সম্পদ জয়ে বিপুল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সৌরজগতের উৎপত্তি

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানবসভ্যতার সুদূর অতীতে মানুষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে অভিভূত বিস্ময়ে নক্ষত্রলোকের রহস্য সন্ধান করেছিল। সুমের, মিশর, চীন, ভারত, আরব প্রভৃতি নানা দেশে এ থেকেই শুরু হয়েছিল বিজ্ঞান সাধনার গোড়াপত্তন। ভ্রাম্যমাণ গ্রহদের গতির নিয়মকানুন সন্ধান করতে গিয়ে পরবর্তীকালে উৎপত্তি ঘটেছিল ধ্রুপদী বলবিদ্যার। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল চলেছিল এই বলবিদ্যার অপ্রতিহত প্রভাব।

এই শতকের প্রথম দিকে বর্ণালীলেখ যন্ত্র সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীরা দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন পরমাণুর অবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে। কিছু দিন পর পরমাণুর বাইরের খোলস ছেড়ে তাঁরা উৎসাহী হয়ে উঠলেন তার কেন্দ্রের রহস্য সন্ধ্যানে। প্রচণ্ড শক্তিমান পরমাণু-ভাঙা যন্ত্র তৈরি হল। পরমাণু-কেন্দ্রের নিয়মকানুন আয়ত্ত করে মানুষ উদ্ভব ঘটাল বিপুল শক্তির।

বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সব সমস্যার আজো সমাধান হয়নি। কিন্তু বিশাল রকেট ও আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত নভোযানের সাহায্যে মানুষ আজ দৃষ্টি নিবন্ধ করতে শুরু করেছে মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধানে। নভোযানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে পৃথিবীর চারপাশের পরিবেশ ও নিকটবর্তী সৌর-মণ্ডল থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তার একটা অন্যতম লক্ষ্য সৌরজগতের জন্মরহস্যের উদ্ঘাটন করা। সূর্য, তার চারপাশের ৯টি গ্রহ, ৫২টি উপগ্রহ, প্রায় এক লক্ষ গ্রহাণু ও কয়েক হাজার কোটি ধূমকেতু মিলিয়ে যে সৌর-পরিবার তার উৎপত্তির রহস্য আজো মানুষের অজানা। মার্কিন ও সোভিয়েত উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই বলেছেন, চাঁদ এবং শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে নভোযান নামিয়ে পরীক্ষা চালাবার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হল এসব বস্তুর আদি ইতিহাসের সন্ধান। মনে হয় আগামী বেশ কিছু দিন ধরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার কেন্দ্রস্থলে থাকবে বিশ্বের আদি উৎপত্তির রহস্য।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ এত দিন পরে বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করার উপায় নেই ; পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতে হবে । মার্কিন বিজ্ঞানী জিরার্ড কয়পার (Gerard Kuiper) বলেছেন ঃ 'একটি বন্ধ ঘরে যদি হাওয়ার কাঁপন জেগে মিলিয়ে যায় তাহলে ক'দিন পরে এই কাঁপনের প্রকৃতি আর কখন সে কাঁপন জেগেছিল তা জানা সহজসাধ্য নয়। এখানেও যেন ব্যাপারটা তেমনি।' অবশ্য তাই বলে বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে দেন নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরোক্ষ প্রমাণ আর কল্পনার একটা শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে দূরের জিনিস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের স্বভাবতই কল্পনা করতে হয়। তবে তাঁদের এই কল্পনা হওয়া চাই বস্তুনিষ্ঠ, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যভিত্তিক। কখনো বা তাঁদের কল্পনা হয় দুঃসাহসিক। দুঃসাহসী কল্পনা ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানী থেলিস (Thales) হিসেব করে বলেছিলেন ৫৮৫ খৃঃ পূঃ সালের ২৮শে মে তারিখে সূর্যগ্রহণ ঘটবে। সেকালে সূর্যগ্রহণের কারণ মানুষের জানা ছিল না ; আর তাঁর সে কথা বিশ্বাসও করেনি কেউ। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সত্যি সত্যি ঘটেছিল সূর্যগ্রহণ ; আর সবাই আশ্চর্য হয়েছিল থেলিসের ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতায়। নিউটনীয় বলবিদ্যার তত্ত্বগত সূত্র থেকে যেখানে নেপচুনের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছিল ঠিক সেখানেই গ্রহটি দূরবীণে ধরা দিল ১৮৪৬ সালে। ১৮৬৯ সালে মেণ্ডেলীয়েফ (Mendele'ev) সেকালে জানা ডজন পাঁচেক মৌলের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে যে পর্যাবৃত্ত ছক সৃষ্টি করেছিলেন তাতে ছিল বেশ কিছু ফাঁক। কিন্তু এই ছকের নিয়ম অনুসরণ করেই পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছিল জার্মানিয়াম, গ্যালিয়াম প্রভৃতি ধাতু। এমনি ধরনের তাত্ত্বিক চিন্তার প্রকাশ আজো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সৌরজগতের জন্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের নানা তত্ত্বে ও সন্ধানে।

সৌরজগৎ সম্বন্ধে যে কোন তত্ত্বই কল্পনা করা হোক, স্বভাবতই বাস্তব তথ্যের সাথে তার সঙ্গতি থাকতে হবে। অর্থাৎ সৌরজগৎ সম্বন্ধে আজ আমরা যে সব কথা জানি তার ব্যাখ্যা সেই তত্ত্বে থাকা চাই। এমনি ধরনের মোটামুটি কতকগুলো তথ্যের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক। সূর্যের চারপাশে ঘুরছে কতকগুলো গ্রহ আর তাদের সবারই পথ প্রায় বৃত্তাকার।

খ। গ্রহগুলোর কক্ষ বা ঘোরার পথ সূর্যের চারপাশে নানা তলে নয় —সবগুলো গ্রহেরই কক্ষ প্রায় সমতলে।

গ। সবগুলো গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরপাক খাচ্ছে একই রকম ভাবে ; উত্তর দিক থেকে দেখলে এই ঘোরাপথকে দেখাবে ঘড়ির কাঁটার উল্টোমুখী। আবার গ্রহেরা (ইউরেনস ছাড়া) নিজ নিজ অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চারপাশেও ঘুরছে একই দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে।

গ্রহদের মধ্যে এই সব মিল থেকে বোঝা যায়, খুব সম্ভব মোটামুটি একই সময়ে একই উপায়ে সৌরজগতের গ্রহদের উৎপত্তি। অর্থাৎ এরা একটি পরিবারের সদস্য।

সৌরজগতে গ্রহদের অবস্থান এবং এদের অন্যান্য প্রকৃতি থেকেও এ রকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। গ্রহদের আরো কিছু সাধারণ তথ্য একটি সারণীর আকারে নীচে দেওয়া হল।

গ্রহদের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান তথ্য

গ্রহের নাম	সূর্য থেকে দূরত্ব (পৃথিবী=১)	গ্রহের ভর (পৃথিবী=১)	গ্রহের ব্যাস (পৃথিবী=১)	গ্রহের ঘনত্ব (পানি=১)	উপগ্রহের সংখ্যা
বুধ	০·৩৯	০.০৬	০·৩৮	৫.৪	০
শুক্র	০·৭২	০.৮২	০.৯৫	৫.২	০
পৃথিবী	১·০০	১·০০	১·০০	৫.৫.	১
মঙ্গল	১.৫২	০·১১	০·৫৩	৩.৯	২
বৃহস্পতি	৫.২০	৩১৮	১১.২৩	১.৩	১৪
শনি	৯.৫৪	৯৫.২	৯.৪১	০.৭	১৭
ইউরেনস	১৯.১৮.	১৪.৬	৪.০৬	১.২	১৫
নেপচুন	৩০.০৬	১৭.২	৩.৮৮	১.৭	২
প্লুটো	৩৯.৪৪	০.১	০.২৭	০.৬	১

এই সারণীর তথ্যগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের কাছাকাছি যে চারটি গ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল)—এরা যেন দূরের গ্রহগুলো থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এদের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট (ব্যাসার্ধ থেকে তা বোঝা যায়), অথচ এদের ঘনত্ব বেশি ; পানির তুলনায় এরা চার-পাঁচ গুণ ভারী। এরপর দূরের যে চারটি গ্রহ (বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন)—এরা আকারে প্রথম চারটি গ্রহের তুলনায় অনেক বেশি বড় ; কিন্তু এদের ঘনত্ব কম, অনেকটা পানির কাছাকাছি। তাতে বোঝা যায় এরা ভিন্ন ধরনের উপাদানে তৈরি। নবম গ্রহ প্লুটো এত দূরে যে এর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া শক্ত।

কাছের আর দূরের গ্রহগুলোর মধ্যে অন্যান্য দিক থেকেও কিছু কিছু তারতম্য রয়েছে। কাছের ছোট গ্রহগুলোর তুলনায় দূরের দানবাকার গ্রহ-গুলো নিজ নিজ অক্ষের চারপাশে ঘোরে তাড়াতাড়ি। পৃথিবীতে আর মঙ্গল গ্রহে দিনরাত হয় প্রায় ২৪ ঘণ্টায় ; কিন্তু বৃহস্পতি, শনি আর ইউরেনস গ্রহের দিনরাত মাত্র ১০ ঘণ্টার মতো। বাইরের গ্রহগুলোর উপ-গ্রহের সংখ্যাও দেখা যায় কাছের গ্রহগুলোর তুলনায় বেশি। সৌরজগতের জন্ম-রহস্যের তত্ত্বে এসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা থাকা দরকার।

গ্রহগুলোর সংখ্যা যথেষ্ট হলেও তাদের মিলিত ভর সূর্যের ভরের তুলনায় অতি সামান্য। সবগুলো গ্রহের ভর যোগ করলে যত হবে তার চেয়ে সূর্যের ভর ৭৪৫ গুণ বেশি। অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগতে (সূর্য ও গ্রহদের মিলিয়ে) যে পরিমাণ বস্তু আছে তার ৯৯.৮৭ শতাংশই রয়েছে সূর্যে আর মাত্র ০.১৩ শতাংশ রয়েছে সবগুলো গ্রহে ছড়ানো।

সূর্য আর গ্রহগুলোর সম্পর্কের ব্যাপারে আরেক উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তাদের কৌণিক ভরবেগ (angular momentum)। আগেই বলা হয়েছে, গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে। আবার সূর্যও ঘুরছে নিজের অক্ষের চারপাশে। কোন বস্তু যখন নির্দিষ্ট বেগে চলতে থাকে তখন তার বস্তুমান (বা ভর) আর বেগকে গুণ করলে পাওয়া যায় তার ভরবেগ। অর্থাৎ ভরের সংকেত m আর বেগের সংকেত v হলে ভরবেগের সংকেত হবে mv। আবার কোন বস্তু যদি বৃত্তাকার বা আর কোন কৌণিক পথে ঘোরে (যেমন একটি ঘূরন্ত গোলক) তাহলে তাতে জন্মাবে কৌণিক ভরবেগ। বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ R হলে সেই বস্তুর কৌণিক ভরবেগের সংকেত হবে mvR। এতে বোঝা যাচ্ছে, ভর, বেগ বা বৃত্তাকার কক্ষের ব্যাসার্ধ—এর যে কোনটি বাড়লে কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা যে ক'টি নিত্যতার সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে 'বস্তুর নিত্যতা' আর 'শক্তির নিত্যতা'র সূত্র জানা ছিল অনেক আগে থেকেই। অর্থাৎ বস্তুকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু তার বিনাশ ঘটানো যায় না ; তেমনি শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু তারও বিনাশ ঘটে না। বিংশ শতকে আইনস্টাইন এই দু'টি সূত্রকে এক সাথে করে ঘোষণা করলেন 'বস্তু আর শক্তির নিত্যতা'র সূত্র। এমনি এক নিত্যতার সূত্র হল 'ভরবেগের নিত্যতা'। অর্থাৎ একটি অন্য নির-পেক্ষ বস্তুসমষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাদের নিজ নিজ ভরবেগের পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু বস্তুসমষ্টির মোট ভরবেগের পরিমাণ একই থাকে।

সূর্যের বিভিন্ন স্তর তার অক্ষের চারপাশে ঘোরার ফলে সূর্যে যে কৌণিক ভরবেগের সৃষ্টি হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা তার হিসেব বের করেছেন। তেমনি গ্রহেরা সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণের ফলে তাদের প্রত্যেকের যে কৌণিক ভরবেগ তারও হিসেব করা হয়েছে। সবগুলো গ্রহের কৌণিক ভরবেগ যোগ করে পাওয়া গেল এক আশ্চর্য অঙ্ক ; গ্রহদের কৌণিক ভর-বেগের যোগফল সূর্যের চেয়ে ৬০ গুণ বেশি। অর্থাৎ সৌরজগতের বস্তুমান যদিও প্রায় সবটাই (৯৯ শতাংশের ওপর) সূর্যে আবদ্ধ, সূর্যের কৌণিক ভরবেগ সৌরজগতের মোট ভরবেগের মাত্র দুই শতাংশেরও কম ; বাকি আটানব্বই শতাংশের বেশী ভরবেগ গ্রহগুলোতে ছড়ানো।

এসব বাস্তব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সৌরজগতের জন্ম-রহস্যের ব্যাখ্যা দেবার জন্যে ফরাসী বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ পিয়ের লাপ্লাস (Pierre Laplace) ১৭৯৬ সালে একটি মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর আগে ১৭৫৫ সালে জার্মান দার্শনিক কান্ট-ও অনেকটা এ ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাই একে কান্ট-লাপ্লাস নীহারিকাবাদও বলা হয়। এই মত অনুসারে সূর্যের আদি বস্তুপুঞ্জের উষ্ণ নীহারিকা থেকেই সবগুলি গ্রহের সৃষ্টি। বিশাল হালকা গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ পাক খেতে খেতে তার মাঝখানে অপেক্ষা-কৃত ঘন বস্তুপিন্ডটি আদি সূর্যের রূপ নেয়। ক্রমে ক্রমে গ্যাসপুঞ্জ ঠান্ডা হতে শুরু করে ; তাতে সংকুচিত বস্তুপুঞ্জের আকার ছোট হয়ে আসে, কিন্তু কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্র অনুসারে ঘোরার বেগ বাড়তে থাকে। প্রচন্ড বেগে পাক খাবার ফলে নীহারিকাপুঞ্জ অনেকটা

মসুর-দানার মতো চ্যাপটা আকারের হয়ে দাঁড়ায়। আর ঘোরার বেগ বাড়ার ফলে বাড়ে তার বিষুবীয় অঞ্চলে কেন্দ্রবিমুখ শক্তি।

কেন্দ্রবিমুখ শক্তি যখন হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্রমুখী মাধ্যাকর্ষের সমান তখন বাইরের একটি খোলস সংকোচনশীল বস্তুপুঞ্জ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। তারপর আরো সংকোচনের ফলে পৃথক হয়ে পড়ে আরেকটি বস্তুপুঞ্জের খোলস। এমনি ভাবে পৃথক হয়ে পড়া বস্তুপুঞ্জের খোলসগুলো ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করে আর ঘুরতে থাকে তাদের আগেকার পাকের গতিপথ অনুসরণ করে। এই সব দলা পাকানো সংকুচিত বস্তুপিন্ডই সূর্যের চারপাশে গ্রহ-উপগ্রহের রূপ নেয়।

ঊনিশ শতকের শেষ অবধি লাপ্লাসের মতবাদই ছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধান মতবাদ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই মতবাদের কতকগুলো ত্রুটি ধরা পড়ে। লাপ্লাসের হিসেবে, সূর্যের চারপাশে ঘুরন্ত গ্যাসপুঞ্জের মধ্যে যে কোন ব্যাসার্ধরেখায় বস্তুকণার আপেক্ষিক স্থানচ্যুতি ধরা হয়নি। অর্থাৎ যেন বাইরের দিকের গ্যাসকণাগুলো ভেতরের দিকের গ্যাসকণার সাথে তাল রাখার জন্যে ঘুরছিল একটু বেশি বেগে। লাপ্লাসের ধারণা সত্যি হলে সবগুলো গ্রহ-উপগ্রহই তাদের কক্ষপথে চলতে চলতে নিজের অক্ষের ওপর সামনের দিকে ঘুরবে আর উপগ্রহরা তাদের চলার বেগ পাবে প্রধানত গ্রহের ঘোরার বেগ থেকে। কিন্তু দেখা গেল মঙ্গলগ্রহ নিজের অক্ষের চারপাশে যে বেগে ঘোরে তার উপগ্রহ ফোবস্ (Phobos) মঙ্গলের চারপাশে ঘোরে তার তিনগুণ বেগে। ইউরেনসের উপগ্রহরা তার চারপাশে ঘোরে সামনের বা পেছনের দিকে নয়, কক্ষের সাথে সমকোণে। নেপচুন, বৃহস্পতি আর শনির কোন কোন উপগ্রহ ঘোরে গ্রহদের পথের উল্‌টো দিকে—অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার মতো। তাছাড়া লাপ্লাসের মত অনুযায়ী কেন্দ্রবিমুখ শক্তির টানে এভাবে সূর্য থেকে বস্তুপিন্ড ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হলে সূর্যের চারপাশে তাদের ঘোরার বেগ আজকের তুলনায় বহু শতগুণ বেশি হবার কথা।

ব্রিটিশ গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী জেম্‌স্ জীন্‌স্ (James Jeans) লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ খন্ডন করে আর এক মতবাদ প্রচার করেন ১৯১৬ সালে। এই মত অনুসারে এক আকস্মিক দৈব ঘটনার ফলে সূর্যের বুক থেকে বস্তুপুঞ্জ ছিটকে উঠে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহদের সৃষ্টি। দৈব ঘটনাটি

হল বিশাল এক নক্ষত্র একদা সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তার এই নৈকট্যের ফলে সূর্যের গ্যাসপুঞ্জের বুকে ওঠে এক প্রবল জোয়ার আর খানিকটা বস্তু ছিটকে আকাশে ওঠে পটলের আকারে। সূর্যের চারপাশে ছুটন্ত খন্ড খন্ড হয়ে যাওয়া এই বস্তুপুঞ্জই ক্রমে ক্রমে ঠান্ডা হয়ে গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম দেয়।

আমাদের দেশে স্কুলপাঠ্য সমস্ত বইতে সৌরজগতের জন্ম সম্পর্কে এই কল্পিত কাহিনীটি বহুল প্রচারিত। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানীদের মতে, বিশাল বিশ্বে নক্ষত্রদের মধ্যে যে বিপুল দূরত্ব তাতে দু'টি নক্ষত্রের এমন সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা আদৌ আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর তাছাড়া সূর্যের দেহ থেকে খন্ড খন্ড বস্তুপুঞ্জ যদি এভাবে ছিটকে উঠেও থাকে তাহলে তাদের সূর্যের কাছাকাছি দূরত্ব দিয়ে তার চারপাশে ঘোরার কথা। অথচ হিসেব নিলে দেখা যায়, গ্রহেরা ছিটকে পড়েছে সূর্য থেকে অস্বাভাবিক রকম দূরে। সূর্যের যা ব্যাস তার তুলনায় সূর্য থেকে বৃহস্পতি গ্রহের দূরত্ব প্রায় ৫০০ গুণ, নেপচুনের প্রায় ৩,০০০ গুণ।

অর্থাৎ লাপ্লাসের মতবাদ সত্যি হলে প্রশ্ন ওঠেঃ গ্রহদের তুলনায় সূর্যের ঘোরার বেগ আর কৌণিক ভরবেগ এত কম হল কেন? আর জীন্‌সের মতবাদ সত্যি হলে প্রশ্ন ওঠেঃ সূর্যের তুলনায় গ্রহদের দূরত্ব এবং কৌণিক ভরবেগ এত বেশি হল কি করে?

ওপরের এসব সমস্যার সমাধান দেবার প্রচেষ্টা হিসেবে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন ভাইৎসেকার (Carl von Weizsacker) ও সোভিয়েত গণিতবিদ শ্মিট (Otto Schmidt) ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রায় একই সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে একটি মত প্রচার করেন। এই মত অনুসারে সৌরজগতের সৃষ্টি আদৌ উত্তপ্ত গ্যাসীয় সূর্য থেকে নয়; বরং শীতল বস্তুকণিকাপুঞ্জ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে সূর্য ও সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহদের। এক হিসেবে এটা লাপ্লাসের নীহারিকাতত্ত্বের সংশোধিত সংস্করণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নানা দেশে আরো অন্যান্য বিজ্ঞানী এই মতের সমর্থন করেন এবং তাঁরা এই মতবাদের আরো বিকাশ সাধন করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য মার্কিন জ্যোতির্বিদ জিরার্ড কয়পার, রসায়নবিদ হ্যারল্ড উরে, ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল এবং খ্যাতনামা সুইডিশ পদার্থবিদ হ্যান্‌স্

আল্‌ফ্‌ভিন (Hannes Alfven)। বলা চলে, কম বেশি মতপার্থক্য থাকলেও এই মতবাদটিই আজকের বিজ্ঞানী মহলে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত।

এই মত অনুসারে সৌরজগতের উৎপত্তি ঘটেছে শীতল আদি বস্তু-কণিকাপুঞ্জ থেকে। নিরন্তর গতিশীল বস্তুকণা এই বিশাল গ্যাসীয় পুঞ্জে সৃষ্টি করেছিল ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য ঘূর্ণি বা আবর্ত (vortex)। সবচেয়ে বড় ঘূর্ণিটিতে বস্তুকণিকা সংহত ও একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদি সূর্যের কেন্দ্রবস্তু। এর চারপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট বিভিন্ন ঘূর্ণিতে জড়ো হতে থাকে প্রথমে বস্তুকণার ভ্রূণ ও ক্রমে ক্রমে নানা আকারের শীতল আদি গ্রহপিণ্ড (protoplanet)। শীতল সূর্যে সংকোচন ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে ঘটেছে তাপের উৎপত্তি। সূর্যের তাপে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংকোচনের সংঘাতে সূর্যের কাছাকাছি গ্রহেরাও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পর-বর্তী পর্যায়ে। এর অর্থ আমাদের পৃথিবীও আদিতে ছিল শীতল! পরে সূর্যের তাপে ও তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ায় এক পর্যায়ে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

আল্‌ফ্‌ভিনের মতে আদি সূর্যের বস্তুপুঞ্জের ছিল প্রবল চৌম্বক আকর্ষণ। তাতেই চারপাশের প্লাজমা কণারা সূর্যের দিকে ছুটে গিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত গ্যাসকণারা আয়নিত হয়ে যাওয়ায় বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের ফলে আবার সূর্য থেকে প্রতিহত হয়; আর ঘুরতে থাকে সূর্যের চারপাশে। সূর্যের খানিকটা কৌণিক ভরবেগ সঞ্চারিত হয় এই সব বস্তুকণায় আর এরাই ক্রমে ক্রমে জমাট বেঁধে সৃষ্টি করে গ্রহ-উপগ্রহদের।

শ্মিটের মতে সূর্যের আকর্ষণে ছুটে আসা বস্তুকণার গতিশক্তি রূপান্তরিত হয়েছে তাপে, আর তাই তাদের দিয়েছে ঘুরবার শক্তি। সূর্যের চার-পাশে বস্তুকণার মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতে ঘটেছে বস্তুকণার নৈকট্য আর পারস্পরিক আকর্ষণে ধূলিকণার মতো বস্তু সংহত হয়ে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বস্তুখণ্ডের। এই ঘনীভূত বস্তুখণ্ডগুলির নিদর্শন আজো দেখা যায় উল্কা কণা ও ধূমকেতুতে। বলা বাহুল্য, আদি বস্তুকণাপুঞ্জ থেকে গ্রহ সৃষ্টির পথে নানা অন্তর্বর্তী ধাপ পেরোতে হয়েছে। সংহত বস্তুখণ্ড বড় আকার ধারণ করে কোথাও কোথাও রূপ নিয়েছে 'ভ্রূণ' গ্রহের এবং তাই পরে আরো বড় আকার নিয়ে গ্রহে পরিণত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ভ্রূণ পরিণত হয়েছে উপগ্রহে।

মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যে যে গ্রহাণুপুঞ্জের বলয় রয়েছে এরও উৎপত্তি সেই আদি বস্তুকণাপুঞ্জ থেকেই। খুব সম্ভব এরা জমাট

বেঁধে গ্রহের রূপ নিতে পারেনি ; তাই আজো বিচ্ছিন্ন বস্তুখণ্ড হিসেবে ছুটে বেড়াচ্ছে। গ্রহাণুগুলোর ব্যাস কয়েকশ' মাইল থেকে মাইল খানেক পর্যন্ত। ছোট আকারের গ্রহাণু আর উল্‌কাপিণ্ডের মধ্যে তফাত খুব সামান্য।

বস্তুকণিকার মেঘপুঞ্জ কি সূর্যের নিজেরই দেহ থেকে সৃষ্টি না সূর্য পেয়েছে তার দেহের বাইরে থেকে—এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে, সম্ভবত আদি সূর্য গ্যাসীয় মেঘের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাইরে থেকেই জমেছে তার চারপাশে বস্তুকণিকা আর আদি গ্রহের খণ্ডগুলি, যা থেকে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে গ্রহ আর উপগ্রহদের ; আর এই জন্যেই সূর্য আর গ্রহদের মধ্যে কৌণিক ভরবেগের এমন বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

সূর্যের সাথে অবশ্য পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের সাদৃশ্য রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এমনি সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহের বস্তুপুঞ্জেও ; এমনকি নক্ষত্র-লোকেও রয়েছে একই ধরনের বস্তুপুঞ্জ। কাজেই সূর্য আর গ্রহদের বস্তুপুঞ্জে সাদৃশ্য থেকেই নিঃসংশয়ে বলা যায় না যে, সূর্যের বুক থেকেই গ্রহদের সৃষ্টি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, গ্রহ সৃষ্টির সেই আদি যুগে সূর্য থেকে কিছু দূরে জমাট বস্তুপুঞ্জ সৃষ্টি করেছিল একটি অস্বচ্ছ মেঘের আবরণ। তাতে সৌরমণ্ডলে সূর্যের কাছাকাছি অংশগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু অস্বচ্ছ মেঘ ভেদ করে দূরের অংশে তাপ যেতে পারেনি। তার ফলে সূর্যের কাছাকাছি গ্রহগুলি থেকে হাল্‌কা গ্যাসীয় বস্তু উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায়, থেকে যায় কঠিন শিলাময় উপাদানগুলি। হয়তো মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি এলাকায় জমেছিল এই ঘন মেঘপুঞ্জ। আর এই কারণেই সূর্যের কাছাকাছি চারটি গ্রহের আয়তন ছোট অথচ ঘনত্ব বেশি। বৃহস্পতি এবং আরো দূরের গ্রহগুলি আকারে বিশাল আর তৈরি প্রধানত হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাসীয় উপাদানে। ধূমকেতুর উপাদানও দেখা যায় প্রায় একই ধরনের। এতে বোঝা যায় দূরের গ্রহগুলি আর ধূমকেতুদের উৎপত্তি সৌরজগতের একই এলাকায়।

শনির ১৭টি উপগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম টাইটান (Titan)। এর আকার প্রায় বুধ গ্রহের সমান আর এর ওপর বায়ুমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া

গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এই বায়ুমণ্ডলে আছে মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি গ্যাস। টাইটান আকারে পৃথিবীর তুলনায় অনেক ছোট—বস্তুমান পৃথিবীর মাত্র চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। তাই এর মাধ্যাকর্ষণও খুব কম। এর ওপর-কার তাপমাত্রা বেড়ে যদি শূন্য ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডেও পেঁছিয় তাহলে সাথে সাথে মিথেন এর গা ছেড়ে উধাও হবে. এতে মনে হয় এই উপগ্রহটি কোন-কালেই উত্তপ্ত ছিল না, কেননা উত্তপ্ত হলে এর মিথেন গ্যাস বহু আগেই মহাশূন্যে পালিয়ে যেত।

তাহলে কতকাল আগে সূর্য বা সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে? —বিজ্ঞানীদের অনুমান আজ থেকে অন্তত পাঁচশ' কোটি বছর আগে। সৃষ্টির পর আদি নীহারিকার বস্তুপুঞ্জে সংকোচন এবং কোটি কোটি কণিকার সংঘাতের ফলে গতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হতে থাকে। সূর্যের বুকে তাপ বাড়তে বাড়তে দশ লক্ষ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পার হলে তাতে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয়। ফলে তাপের আরো দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সূর্যের এই তাপই এতদিন ধরে পৃথিবীর বুকে সব রকম শক্তির জোগান দিয়েছে ; প্রাণের উষ্ণ প্রবাহকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন আজ থেকে পাঁচশ' কোটি বছর পর সূর্য আরো উত্তপ্ত হতে শুরু করবে—তার আয়তনও অনেকখানি ফেঁপে উঠবে। স্বভাবতই এর ফলে পৃথিবীর ওপরকার তাপ যাবে বেড়ে। তার পরের একশ' কোটি বছরে পৃথিবীর ওপরকার তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াতে পারে প্রায় ৫০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। বলা বাহুল্য, তাতে পৃথিবীর ঘটবে মৃত্যু ; বিজ্ঞানীরা বলছেন এর পর সূর্য সংকুচিত হয়ে ক্রমে ক্রমে একদিন চির-দিনের মতো নিভে যাবে।

সৌরজগৎ উৎপত্তির আধুনিক মত অনুসারে মহাবিশ্বে বিপুল সংখ্যক নক্ষত্রের মতো সূর্যও একটি নক্ষত্র—কোন অসাধারণ ব্যতিক্রমী বস্তু নয়। নীহারিকাপুঞ্জ থেকে সূর্যের সৃষ্টিপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে আরো বহু নীহারিকায় নক্ষত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। সূর্যের চারপাশে গ্রহ বা বড় বড় গ্রহের চারপাশে উপগ্রহের উদ্ভবও কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এই একই সাধারণ ঘটনা-পরম্পরা হয়তো রূপ নিচ্ছে আরো অসংখ্য নীহারিকার বুকে, অসংখ্য নক্ষত্রের চারপাশে। এমনি বহু সংখ্যক নক্ষত্রের গ্রহ-উপগ্রহ পরিবৃত পরি-বারে যে আর কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব ঘটেনি তাই বা কে বলবে ?

বলা বাহুল্য, এ সবই বিজ্ঞানীদের দুঃসাহসিক কল্পনা। এই সব কল্পনাকে যাচাই করে সত্য নির্ধারণ করার জন্যে নভোবিজ্ঞানীরা সৌরজগতের সর্বত্র ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে চাঁদের ধুলোমাটি থেকে বা শুক্র, মঙ্গল গ্রহে অভিযান চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে সৌরজগতের উৎপত্তির দিক দিয়ে তার চেয়েও মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হতে পারে গ্রহাণু (asteroid), উল্কাকণা ও ধূমকেতুর বস্তু পরীক্ষা থেকে। গ্রহ সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বস্তুর যে আদিম অবস্থা ছিল তার বেশির ভাগই হয়তো আজ তলিয়ে গিয়েছে গ্রহের গভীর স্তরে। তাছাড়া ওপরের স্তরে ঘটেছে নানা ভূতাত্ত্বিক ও আবহাওয়াগত পরিবর্তন। চাঁদের বেলাও একথা অনেকখানি সত্যি। সে হিসেবে মহাশূন্যের ছোট ছোট বস্তুখণ্ডে খুব সম্ভব পরিবর্তন ঘটেছে সবচাইতে কম। এদের দেহবস্তু পরীক্ষা করলে পাওয়া যেতে পারে গ্রহের উৎপত্তির গোড়ার অবস্থার মোটা-মুটি প্রতিচ্ছবি।

বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা শুধু সৌরজগতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। নভোবিদ্যার অগ্রগতি মানুষের জন্যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের জন্ম-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরো নতুন তথ্যের সন্ধান দেবে। আর এভাবেই ঘটবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি মৌলিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি।
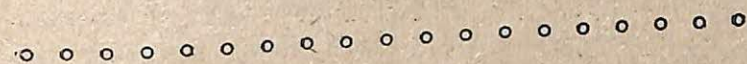
নক্ষত্র-রহস্য

আদি মানব নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আকুল বিস্ময়ে অভি-
ভূত হয়েছিল ; তার সেদিনের সে-বিস্ময়ের রেশ আজও আমরা কল্পনায়
আনতে পারি। তার সে বিস্ময় তো শুধু বিস্ময় ছিল না, তাতে ছিল এক
আদিম আবিষ্কারকের অদম্য কৌতূহল আর ব্যগ্র জিজ্ঞাসাও। তাই বুদ্ধি-
বৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করেছে নক্ষত্র-
খচিত আকাশের রহস্যময় জগৎকে।

তারপর মানুষের সভ্যতা যত এগিয়েছে, তার জ্ঞানের পরিধি যত
বেড়েছে, মানুষ দেখেছে নক্ষত্রজগৎ শুধু ভয়ের, বিস্ময়ের বস্তু নয়, জানা-
জানির মধ্য দিয়ে সে হতে পারে মানুষের আপনার, আত্মীয়জন। এই
চেনা-জানার পথেই মরুচারী যাযাবর মানবকে, সাগরপারের অজানা দেশের
অভিযাত্রী দুঃসাহসী পথিককে দেশ থেকে দেশান্তরে পথ দেখিয়ে নিয়েছে
নক্ষত্র-রাজ্যের নিশানা। আর সেই আদি যুগের নক্ষত্রচর্চা থেকেই ক্রমে
ক্রমে গোড়াপত্তন হয়েছে পরবর্তীকালের সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের।

রাত্রে নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকালে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক খণ্ড
নিরবচ্ছিন্ন আলোকপথ দেখা যায়। এই 'ছায়াপথ'-কে ঘিরে যুগে যুগে
কত যে স্বর্গলোকের কাহিনী রচিত হয়েছে, নক্ষত্রজগতের সন্ধানী জ্যোতি-
র্বিজ্ঞানীরা এর রহস্যসন্ধানে আকাশের দিকে তাকিয়ে কত বিনিদ্র রাত্রি
কাটিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে গ্যালি-
লিও দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখালেন, পৃথিবীর বুক থেকে যাকে অপরূপ
রহস্যময় আলোকপথ বলে ভ্রম হয় আসলে তার মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি
নক্ষত্রের মেলা। আর সেগুলো আমাদের পৃথিবী থেকে এমন কল্পনাতীত
রকম দূরে যে এই দূরত্ব এদের আলোককে করেছে ম্লান, সন্নিবেশকে করেছে

নিবিড়—আর তাই এদের পৃথক পৃথক সত্তাকে ছাপিয়ে যে সামগ্রিক রূপ আমাদের অনুভূতিতে এসে ধরা দেয় সে হল এক নিরবচ্ছিন্ন আলোকপথের।

ছায়াপথের এমনি অগুন্তি নক্ষত্রের মতো আমাদের সূর্যও একটি নক্ষত্র—আমাদের সমগ্র সৌরমন্ডল হচ্ছে ছায়াপথের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সে হিসেবে, পৃথিবীও এই নক্ষত্রপুঞ্জেরই অঙ্গ ;—তবে সে তার আপন গৌরবে নয়, ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত সূর্যের পরিবারে মাধ্যাকর্ষণের টানে যুক্ত বলে।

উপমা দিয়ে বলা যায়, 'ছায়াপথের' নক্ষত্রমণ্ডল যদি হয় একটা বিরাট নগর, তবে তার মধ্যে 'সৌরজগৎ' হবে একটি ছোট্ট 'কুটির'। অবশ্য আরও অনেক উপমার মতো এই উপমাকেও বেশি দূর টেনে নেবার বিপদ আছে। কেননা এমন কোন শহরের কথা কি কখনও শোনা গিয়েছে যা ক্রমাগত নিজের চারপাশে ঘুরপাক খায়? কিংবা এমন কোনও বাড়িই কি কেউ কখনো দেখেছে যা কেবলই শূন্যে ছুটে বেড়ায়?—অথচ আমাদের নক্ষত্র-জগৎ ২০ কোটি বছরে একবার তার কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে আসে। সৌর-জগতের চরকিপাক আর শূন্যে ছুটে বেড়ানোর কথা তো কারো অজানা নয়।

যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে নক্ষত্রজগতের অনেক তত্ত্বই আজ মানুষের আয়ত্তে এসেছে, তেমনি আবার অনেক তথ্য এখনও রয়েছে রহস্যাবৃত। তাই, সৌরজগতের মতো অসংখ্য নক্ষত্র পরিবারের মেলা নিয়ে এই যে বিরাট এবং বিপুল বিশ্ব সে-সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আহরণে, তার নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটনে আজও বিজ্ঞানীদের উৎসাহ অদম্য, তাঁদের অনুসন্ধিৎসা অপরিমেয়।

কিন্তু এ-ব্যাপারে জ্ঞান লাভের পথ বড় বন্ধুর—বাধার পাহাড় পর্বত-প্রমাণ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা হল ছায়াপথের নক্ষত্রজগৎ বেশ খানিকটা চ্যাপ্টা আর তার মধ্যবর্তী আকাশে গ্যাসের আকারে ছড়িয়ে আছে বিপুল পরিমাণ বস্তুপুঞ্জ। এদিকে ছায়াপথের বিস্তার এত বেশি যে তার দূরের সীমানা থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে অনেক হাজার বছর কেটে যায়। আর এত দূর থেকে ধোঁয়াটে বস্তুপুঞ্জের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে এই সব নক্ষত্রের খুব কম আলোই আর বাকি থাকে, বেশির ভাগ মাঝপথেই আট্‌কা পড়ে।

ছায়াপথকে অনেকটা পাতলা বিস্কুটের চেহারার সঙ্গে তুলনা করা চলে। নক্ষত্রজগতে দূরত্বের পরিমাণ এমন বিপুল যে মাইলের হিসেব দিয়ে সুবিধে হয় না ; ব্যবহার করতে হয় আলোক বছরের মাপ। আলো সেকেণ্ডে প্রায়

১,৮৬,০০০ মাইল পথ ছুটতে পারে। এক "আলোক বছর" হল এক বছর বা ৩৬৫ দিনে আলো কতটা পথ পেরোতে পারে তার সমান ; অর্থাৎ মোটামুটি ছ'লক্ষ কোটি মাইল। ছায়াপথের ব্যাস মোটামুটি এক লক্ষ আলোক-বছর, আর গড় বেধ প্রায় সাত হাজার আলোকবছর। ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা মোটামুটি দশ হাজার কোটি ; অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা যত, তার চেয়ে অন্তত বিশ গুণ বেশি। এই হিসেব থেকেই এর বিরাটত্বের একটা ধারণা হবে। সূর্য আর তার গ্রহজগতের অবস্থান ছায়াপথের চাকতির কেন্দ্র থেকে এক পাশে মোটামুটি ত্রিশ হাজার আলোকবছর দূরে।

কিন্তু ছায়াপথের এই বিরাটত্বই সব নয়। 'ছায়াপথ' নিয়ে তৈরি আমাদের যে আপন বিশ্ব বা গ্যালাক্‌সি, এর বাইরে মহাকাশে রয়েছে এমনি আরো অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, আরো অনেক বিশ্ব। এই সব অগুন্‌তি নক্ষত্র-পুঞ্জের যেমন বহুবিচিত্র আকার তেমনি বিচিত্র এদের প্রকৃতি। এদের কোনটার চেহারা গোল, কোনটার লম্বা, কোনটা দেখতে কিম্ভূতকিমাকার। কোনটা কুণ্ডলীর আকার, তাদের গা থেকে বেরিয়েছে প্যাঁচানো ডালপালা, কোনটার সে-সব বালাই নেই। নক্ষত্রসমাবেশ কোথাও হালকা, কোথাও আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল নীহারিকা, কোথাও বা কালো মেঘের মতো অন্ধকারে লেপ্টে দেওয়া মরা নীহারিকা।

নক্ষত্রপুঞ্জগুলোকে যে আমরা অনেক দূর থেকে দেখতে পাই তাতে অসুবিধে যেমন আছে, তেমনি সুবিধেও নেহাত কম নয় ; কারণ তার ফলে এদের আকার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হয়। অতি বড় কোন শহরের সত্যিকার চেহারা যদি দেখতে হয় তাহলে উড়ো-জাহাজে চড়ে উঠতে হবে উঁচুতে ; শহরের মাঝখানে কোন পথের ওপর দাঁড়ালে আকাশচুম্বী প্রাসাদ আর দেয়াল দৃষ্টিপথের সামনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি, নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝখানে দাঁড়ালে চতুর্দিকের ধোঁয়াটে বস্তুপুঞ্জ ডিঙিয়ে তার সাধারণ আকার সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া যাবে না, ধারণা পেতে হলে তাকে দেখতে হবে বাইরে থেকে।

গ্যালিলিওর পর তিনশ' বছরের ওপর মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে বিজ্ঞানীদের একমাত্র উপকরণ ছিল আলোক-দূরবীণ আর বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র। এই শতকের তিরিশের দশকে আবিষ্কৃত হল বেতার-দূরবীণ। দেখা গেল নক্ষত্র আর নীহারিকা থেকে দৃশ্য আলোর রশ্মি যেমন পৃথিবীতে পৌঁছয় তেমনি আসে বেতার তরঙ্গ। আজ সারা দুনিয়ায় অসংখ্য বিশাল বেতার দূরবীনের সাহায্যে আকাশের অতি দূর অঞ্চলের নক্ষত্রলোকের খবরা-

খবর মানুষের কাছে লভ্য হয়েছে।

ছায়াপথ যে শুধু কয়েক হাজার কোটি বিচ্ছিন্ন নক্ষত্রের ভিড় তাই নয়, তাতে আছে অনেক জোট বাঁধা নক্ষত্রের মেলা। কোথাও এই জোট মাত্র দু'টি নক্ষত্রকে নিয়ে, এদের বলা হয় যুগল জোট ; কোথাও জোট তিনটি নক্ষত্রের, তাকে বলা হয় ত্রয়ী জোট ; কোথাও তার চেয়েও বেশি তারা জোট বেঁধে সৃষ্টি করে তারকাগুচ্ছ। এমনি যে মাঝে মাঝে জোট বাঁধা নক্ষত্রের মেলা, তার প্রত্যেকের আবার দু'রকমের গতি ঃ এক গতি জোটের মধ্যে, তার নিজস্ব ভরকেন্দ্রকে ভিত্তি করে আবর্তন, আরেকটা সমগ্র জোটকে নিয়ে, নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্রের চতুর্দিকে পরিক্রমণ।

বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা যায়, এই সব আলাদা জোটের ওপর নক্ষত্রজগতের সব নক্ষত্রেরই নিজ নিজ আকর্ষণের টান রয়েছে। তার ফলে, প্রত্যেকটা জোট যেমন নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তেমনি তাদের মধ্যে সব সময়ই কাজ করছে নিজেদের জোট ভেঙে দেবার এক আত্মঘাতী প্রবণতা। অথচ, এই যে জোট ভেঙে বিবাগী হয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা তাকে ঠেকিয়ে রাখছে জোটের নক্ষত্রগুলোর পরস্পরের আকর্ষণের টান। নিজেদের মধ্যেকার টানের জোর বেশি বলেই জোটগুলো সহজে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে পারে না।

কিন্তু হঠাৎ কখনো নক্ষত্রচক্রের সমাবেশে নিবিড়তার পরিমাপ যদি হয় কম তাহলে ঘূর্ণিপাকের বেগে ছিট্‌কে ভেঙে পড়ার শক্তিটাই হয়ে ওঠে জোরালো, আর শেষ পর্যন্ত জোটের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়ে পড়ে কঠিন। অর্থাৎ এ-রকম হাল্কা বাঁধুনির নক্ষত্রচক্রের পক্ষে বেশিদিন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অথচ বিজ্ঞানীরা আমাদের নিজেদের বিশ্ব অর্থাৎ ছায়াপথের মধ্যেই এ ধরনের হালকা বাঁধুনির উষ্ণ নক্ষত্রচক্রের খোঁজ পেলেন। তাদের মধ্যে একটা যযাতি (Perseus) মণ্ডলের জুড়ি নক্ষত্রের আশেপাশে ছড়ানো। আরেকটা আছে বৃশ্চিক রাশিতে—একটা সাধারণ ধরনের মোটামুটি ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের চারপাশে ছড়িয়ে। এমনি অতিমাত্রায় উষ্ণ নক্ষত্রদলের একটা সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে O-শ্রেণীর জোট। এসব তারার রঙ নীল আর গায়ের তাপমাত্রা মোটামুটি পঁচিশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এদের ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি।

আগেই বলা হয়েছে, জোটের বাঁধুনি যদি হয় অতিমাত্রায় আল্গা তবে শীগ্গিরই নক্ষত্রগুলো অস্থির হয়ে ওঠে সমগ্র জোটটা ভেঙে দেবার জন্যে। অতীতে দীর্ঘ দিন ধরে এরা এমনি অব্যবস্থিত অবস্থায় কাটিয়েছে এমন কল্পনা করা যায় না, অর্থাৎ এ-সব নক্ষত্র বয়সে নবীন। বিজ্ঞানীদের হিসেব মতো এদের বয়স কয়েক কোটি বছরের বেশি হবে না। নক্ষত্রজগতের বয়সের মাপকাঠিতে বিচার করলে একে খুবই কম সময় বলতে হবে। আর এ-থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই সব অতি-উষ্ণ O-শ্রেণীর নক্ষত্র এখনও তাদের শৈশব পেরোয়নি।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, নক্ষত্রগুলোর বস্তু পরিমাণে সাধারণত আকাশ-পাতাল তারতম্য হয় না। কচিৎ আমাদের সূর্যের চেয়ে দশগুণ বেশি বা দশগুণ কম ওজনের নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওজন সূর্যের কাছাকাছি থাকলেও আকারে বিরাট রকম তফাত ঘটতে কোন বাধা নেই। তাই আকারের এক সীমানায় আছে কালপুরুষমণ্ডলীর লাল রঙের মহাকায় দানব তারা আর্দ্রা (Betelgeuse) বা বৃশ্চিক রাশির জ্যেষ্ঠা (Antares)। এদের কেবল বপুটাই বিপুল, আসলে বস্তু পরিমাণ এমন বেয়াড়াভাবে ফাঁপানো যে আমাদের পৃথিবীর হাওয়ার চাইতেও তা বহুগুণে হালকা। এরা M-শ্রেণীর তারা ; এদের গায়ের তাপমাত্রা কম ; মাত্রই দু'তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

তাপমাত্রার হিসেবে O-শ্রেণী আর M-শ্রেণী এই দুই প্রান্তের মাঝামাঝি আছে আরো নানা শ্রেণীর তারা। যেমন A-শ্রেণীর তারাদের রঙ সাদা ; গড় তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এমনি তারা কালপুরুষের লুব্ধক (Sirius), বা অভিজিৎ (Vega)। আমাদের সূর্য পড়ে G-শ্রেণীতে। এ শ্রেণীর তারাদের রঙ হলদে ; তাপমাত্রা ছ'হাজার ডিগ্রির মত।

আবার সাদা রঙের 'শ্বেত বামন' তারাগুলো আরেক জাতের। এরা আকারে ছোট, কিন্তু ওজনে কম নয়—এদের ঘনত্বের কাছে সীসে-প্লাটিনাম হার মানে। অতি-উষ্ণতায় ঘন গ্যাস ভারি হয়ে ওঠে প্লাটিনামের তিন হাজার গুণ বেশি—এক ঘন ইঞ্চি বস্তুর ওজন দাঁড়িয়ে যায় এক টনের কাছাকাছি।

যেসব তারাদের দীপ্তি কমে বাড়ে, তাদের নাম রাখা হয়েছে 'বিষম তারা'। দীপ্তির এই পরিবর্তনশীলতার সাধারণত দু'টো ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে সম্ভবত কোন কম দীপ্তির জুড়ি নক্ষত্র একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এদের ঢেকে আড়াল করে ফেলে। দ্বিতীয় মত হচ্ছে,

কয়েক দিনের মধ্যে এরা পর্যায়ক্রমে একবার ফুলে-ফেঁপে ওঠে, আবার চুপ্‌সে ছোট হয়ে যায়। এমনি আয়তনের জোয়ার-ভাটা চক্রাকারে চলতে থাকে।

কখনো বিষম তারার দীপ্তি আকস্মিক বহু গুণ বেড়ে যায়। খালি চোখে প্রায় অদৃশ্য তারা তখন আকাশে উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে ; এ অবস্থাকে বলা হয় 'নোভা' বা 'নবতারা'। খালি চোখে প্রতি পাঁচ-দশ বছরে একটি এ রকম নোভা দেখতে পাওয়া যায়। কদাচিৎ কোন বড় নক্ষত্র বিপুলভাবে বিস্ফারিত হয়ে সৃষ্টি করে অতি-উজ্জ্বল 'সুপারনোভা'। প্রাচীন চীনা জ্যোতির্বিদরা ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে এ রকম একটি সুপারনোভা আকাশে জ্বলতে দেখেন এক বছরের বেশি সময় ধরে। আজও এর ধ্বংসাব-শেষ দেখা যায় কালপুরুষ মণ্ডলে 'কর্কট নীহারিকা' নামে বিপুল গ্যাসের পুঞ্জ হিসেবে।

বিজ্ঞানীরা আজ জেনেছেন আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের মতো নক্ষত্রপুঞ্জ বা বিশ্ব রয়েছে অন্তত হাজার কোটি। আর তার প্রতিটি বিশ্বে নক্ষত্র রয়েছে কয়েক কোটি থেকে বহু লক্ষ কোটি পর্যন্ত ; গড়পড়তা হিসেব আমাদের ছায়াপথেরই মতো, অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার কোটি। এছাড়া আছে অজস্র ছড়ানো বস্তুকণা আর গ্যাসপুঞ্জের নীহারিকা। তাহলে এই অসংখ্য বিশ্ব মিলিয়ে যে মহাবিশ্ব তাতে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা কত আর তার পরিমাণই বা কত তার হিসেব করাও দুঃসাধ্য। তবে এটা জানা গেছে যে আমাদের বিশ্বে মোট বস্তুর শতকরা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ভাগই আছে নক্ষত্রের আকারে ; বাকিটা আন্তঃনক্ষত্র বা আন্তঃগ্যালাক্সি মহাকাশে গ্যাস বা ধুলোর আকারে ছড়ানো। গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেনই প্রধান। আন্তঃগ্যালাক্সি মহাকাশের প্রধান উপা-দান অতি ছড়ানো হাইড্রোজেন গ্যাস।

এই মহাবিশ্বে শুধু যে নক্ষত্ররাই জোট বেঁধে আছে তাই নয়, এর বিশাল আয়তনে সঞ্চরমাণ অগুন্‌তি নক্ষত্রের জোট মিলিয়ে যে সব বিশ্ব বা গ্যালাক্সি, তারাও আছে দল বেঁধে। আমাদের বিশ্ব বা ছায়াপথ যে দলের সদস্য সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট দল, তাতে আছে মোটামুটি শ'দুই গ্যালাক্সি। এই দলে আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যে গ্যালাক্সিটি সেটা খালি চোখে অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এটা রয়েছে অ্যান্‌ড্রোমিডা মণ্ডলে, বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এম-৩১। আমাদের কাছ থেকে এর দূরত্ব প্রায় বিশ লক্ষ

আলোকবছর। আমাদের গ্যালাক্সি-দলকে বিজ্ঞানীরা বলেন "স্থানীয় দল"। এর বেড় প্রায় ৬৫ লক্ষ আলোকবছর। এমনি আরো বহু বিশ্ব-দলের হদিস মিলেছে ; তার কোন কোনটিতে গ্যালাক্সির সংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

নক্ষত্রজগৎ এমন দূরে দূরে ছড়ানো যে, পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় তাদের কোন আপেক্ষিক স্থানচ্যুতি নেই অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে তাদের দূরত্ব স্থির। কিন্তু বাস্তব অবস্থা একেবারেই অন্য রকম। গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্রেরা অনবরতই ছুটছে প্রচণ্ড বেগে, আবার তেমনি প্রতিটি গ্যালাক্সি ছুটে চলেছে মহাশূন্যে। মানুষের তৈরি সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু নভোযান কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরপাক খায় সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল বেগে ; পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে বেরোবার সময় তার বেগ হয় সেকেণ্ডে সাত মাইলের মতো। অথচ আমাদের সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছুটে চলেছে সেকেণ্ডে প্রায় ১২ মাইল বেগে আর একটি কুণ্ডলীর বাহুলগ্ন হয়ে বিশাল চরকিবাজির মতো ছায়াপথ গ্যালাক্সির চারপাশে ঘুরছে সেকেণ্ডে প্রায় ১৩০ মাইল বেগে। এভাবে সূর্য (আর তার সাথে সাথে সৌরজগৎ) ছায়াপথ গ্যালাক্সির চারপাশে এক পাক ঘুরে আসে প্রায় বিশ কোটি বছরে। এমনি ছুটোছুটি আর ঘূর্ণিনাচন চলেছে প্রতিটি নক্ষত্রে আর গ্যালাক্সিতেই।

বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছেন, সব নক্ষত্র আর গ্যালাক্সিই যেন প্রবল বেগে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছুটে চলেছে। তাহলে এই কোটি কোটি নক্ষত্র আর বিশ্বের সমাবেশ নিয়ে যে মহাবিশ্ব তার আয়তন কত বড়? সে আয়তন কি অসীম? আর যদি সব বস্তুই এভাবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে কি সুদূর অতীতে কোন একদিন একটি সাধারণ কেন্দ্র থেকে বিপুল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই বিস্ফারমাণ মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে? কোন কোন বিজ্ঞানী আদি অতীতের সেই শুভ দিনের একটি হিসেবও বের করেছেন? তাঁদের হিসেবে সব নক্ষত্র আর নক্ষত্র বিশ্বের উদ্ভব আজ থেকে অন্তত ১৫০০ কোটি বছর আগে এক বিপুল বিস্ফোরণ থেকে।

আরেক দল বিজ্ঞানী অবশ্য এই মত পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা বলছেন, পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রেরা সব এক পর্যায়ের নয়, অতি উষ্ণ O-শ্রেণীর নক্ষত্রেরা বয়সে নবীন, তাদের আলো নীল ; আবার কেউ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ, তাদের ফেঁপে ওঠা দানবাকার দেহের রঙ লাল, তাপমাত্রা কম। আরো বৃদ্ধ তারারা অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে উঠে চুপ্‌সে ছোট হয়ে

যায়, আর উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলতে থাকে। এরাই 'শ্বেত বামন' তারা। অর্থাৎ নক্ষত্রের যেমন উৎপত্তি আছে, তেমনি আছে ক্রম পরিণতি ; আর আন্তঃনাক্ষত্র আর আন্তঃবিশ্ব শীতল বস্তু থেকে মনে হয় ক্রমাগতই নতুন নতুন নক্ষত্র আর নতুন নতুন বিশ্বের জন্ম ঘটে চলেছে। তাঁদের এ মতকে বলা হয় 'সাম্যাবস্থার বিশ্ব'।

আবার কেউ বলছেন, আসলে মহাবিশ্ব বিস্ফারিত হতে হতে একদিন তার ফেঁপে ওঠা থেমে যাবে, তারপর মাধ্যাকর্ষণের টানে মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জ সংকুচিত হতে শুরু করবে। তারপর হয়তো হাজার কোটি বছর পরে এক অতি সংকুচিত অবস্থায় পেঁছে ঘটবে এক নতুন বিস্ফোরণ ; শুরু হবে আবার এক নতুন বিস্ফারণের পালা।

বলা বাহুল্য বিশ্বপ্রকৃতির রূপ সম্বন্ধে এসব প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা এখনো হয়নি ; পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নানা মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এবং সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা আজো চলেছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে এমন সব নক্ষত্র যাদের আলোক-সম্পদ কম কিন্তু বেতার তরঙ্গের উৎসারণ অতি শক্তিশালী। এদের নাম দেয়া হয়েছে 'কোয়াসার্‌স' বা নক্ষত্রসদৃশ বেতার-উৎস। আবার আর কিছু অদৃশ্য নক্ষত্রের হদিস মিলেছে যাদের কোন আলো নেই কিন্তু এদের গা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বেতার সংকেত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এদের নাম 'পালসারস' বা স্পন্দনশীল বেতার-উৎস। বিজ্ঞানীরা বলছেন সম্ভবত এগুলো বড় নক্ষত্রের অন্তিম অবস্থা ; প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের বলে বস্তু সংকুচিত হতে হতে এমন অকল্পনীয় রূপে ঘন হয়ে ওঠে যে পরমাণুর আদি কণিকারা সব তালগোল প্যাকিয়ে অতি ক্ষুদ্র স্থান নেয়। এ ধরনের তারা তখন হয়ে দাঁড়ায় 'নিউট্রন তারা'।

কিন্তু পরেরও পর থেকে যায়। মনে করা হচ্ছে বিবর্তনের পরের স্তরে নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ এমন প্রচণ্ড রকম শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তা সব কিছুকে গ্রাস করে নেয়, এমন কি বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগামী যে আলো তাও এর বাঁধন কাটিয়ে বেরোতে পারে না। সেই অন্ধকার সর্বগ্রাসী বস্তুপিণ্ডের নাম দেয়া হয়েছে 'কৃষ্ণ গহ্বর'।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, এসব নিউট্রন তারা, কৃষ্ণ গহ্বর প্রভৃতি সৌরজগতের ধারে কাছে নেই ; এদের হদিস পাওয়া গিয়েছে অতি দূরে—পৃথিবী থেকে একশো কোটি আলোকবছর বা তার চেয়েও বেশী দূরে।

এই সঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। সে হল যে সব

নক্ষত্রকে বা গ্যালাক্সিকে আমরা আজ পর্যবেক্ষণ করছি তারা আদপেই আজ বর্তমান রয়েছে কিনা তা বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুদূর অতীতে এরা যে আলোক বা বেতার তরঙ্গ উৎসারিত করেছিল তাই বহু বছরের পথ পরিক্রমার পর এসে পেঁছচ্ছে আমাদের কাছে। যে লুব্ধককে আমরা আজ দেখছি সেটা সেখানে ছিল অন্তত ন' বছর আগে, যে কৃত্তিকা বা সাত ভাই চম্পা (Pleiades)-কে নিয়ে কবিরা কাব্য রচনা করছেন তার এ দৃশ্য অন্তত পাঁচশ' বছরের পুরনো। অর্থাৎ মহাকাশের দৃশ্য বা ঘটনামাত্রই অতীতের। আর নক্ষত্রলোকের ঘটনাপুঞ্জ যেহেতু বহু কোটি বছরে ব্যাপ্ত, কাজেই মানুষের ভবিষ্যতের জন্যে আগামী কয়েক কোটি বছরে নক্ষত্রলোক থেকে কোন প্রচণ্ড বিপদের আশঙ্কা ঘটবে এমন সম্ভাবনা অতিমাত্রায় ক্ষীণ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মহাকাশে আর কোন নক্ষত্রের গ্রহজগৎ রয়েছে কিনা এবং থাকলে সে সব গ্রহজগতে মানুষের মত বা মানুষের চেয়েও উন্নত কোন প্রাণিজগতের উদ্ভব ঘটেছে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলেছে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব ৪.৩ আলোকবছর; অন্যান্য নক্ষত্রের দূরত্ব আরো অনেক বেশী। নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহজগৎ থাকলেও তার ভর হবে নক্ষত্রের তুলনায় অতি সামান্য আর সে সব গ্রহের নিজস্ব দীপ্তি থাকার সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় নক্ষত্রের গ্রহজগতের সন্ধান নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়। তবু বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে অপেক্ষাকৃত কাছের ক'টি তারার গতিপথে এমন বিশিষ্টতার সন্ধান পেয়েছেন যা থেকে মনে হয় এসব নক্ষত্রের আশেপাশে গ্রহজগতের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বার্নার্ডের তারা (পৃথিবী থেকে ছয় আলোকবছর দূরে), ৬১-সিগনি, এপসাইলন এরিডানি, টউসেটি ইত্যাদি।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী মোটামুটি তারাদের মধ্যে কত ভাগের গ্রহজগৎ থাকা সম্ভব এবং তাদের মধ্যে আবার কত ভাগে মানুষের মত বা মানুষের চেয়ে উন্নত প্রাণী থাকা বা সভ্যতার উন্মেষ ঘটা সম্ভব তারও একটা হিসেব খাড়া করেছেন। এই হিসেব অনুযায়ী যদি ছায়াপথের মাত্র এক শতাংশ নক্ষত্রের গ্রহজগৎ থাকে, আর প্রতি হাজার গ্রহজগতের একটিতে বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব ঘটে থাকে তাহলে শুধু আমাদের ছায়াপথ বিশ্বেই কয়েক লক্ষ গ্রহজগতে সভ্যতার বিকাশ ঘটে থাকতে পারে বলে তাঁরা অনুমান করছেন।

আর শুধু অনুমান নয়, শক্তিশালী বেতারের সংকেত পাঠিয়ে এসব

নক্ষত্রচারী সভ্য প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনেরও চেষ্টা শুরু হয়েছে। এখনও এতে তেমন আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি ; তবে এতে বিজ্ঞানীরা হতাশ হননি, কেননা তাঁরা জানেন যে সভ্য প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব এমন নিকটতম নক্ষত্রে বেতারের সঙ্কেত যেতে এবং সেখান থেকে প্রত্যুত্তর আসতেও বহু বছর সময়ের প্রয়োজন।

নক্ষত্রজগতের পরিধি এমন বিপুল যে স্বভাবতই এ-সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ। তবে এ কথা আজ স্পষ্ট যে, যুগ যুগ ধরে দার্শনিক পণ্ডিতরা এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন শুধু দর্শনের কূট তর্কজালে যার মীমাংসা হবার নয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আলোকেই কেবল এ-সব প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য সমাধান পাওয়া সম্ভব। গবেষণার নতুন নতুন হাতিয়ার আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে নক্ষত্রলোকের রহস্য সন্ধান আজ ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে।—অনুসন্ধান যত এগোচ্ছে তত বেশী তথ্য মানুষের হাতে আসছে। আর বলা বাহুল্য এই জানাজানির মধ্য দিয়েই নক্ষত্ররাজ্যের রহস্যের কুজ্ঝটিকা ঝরে গিয়ে এরা ক্রমে ক্রমে মানুষের আরো আত্মজন, আরো আপনার হয়ে উঠবে।

আইনস্টাইনের জগৎ

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

আজকের মানুষের সভ্যতার কীর্তি অতীতের সর্বকালের ঊর্ধ্বে এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বস্তুগত পরিবেশ ও মননের ক্ষেত্রে মানুষ আজ যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে তা গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে অসংখ্য বিজ্ঞানী মনীষার অবদান। এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে সকলের ওপরে কার স্থান? এরকম প্রশ্ন কি করা চলে?—প্রশ্ন যদি বা করা চলে তার জবাব দেয়া সহজ হয় না।

এই শতকের শুরুতে আইনস্টাইন এর একটা জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান নিউটনের প্রাপ্য। নিউটন যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারতেন তাহলে তাঁর মত কি হত, তিনি আইনস্টাইনের অবদানকে তাঁর নিজের অবদানের চেয়েও বড় বলে ভাবতেন কিনা, এ প্রশ্ন তোলা আজ অবান্তর। তবে সতের শতকে নিউটন বিশ্ব-জগতের রূপ সম্পর্কে যে বৈপ্লবিক ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, তাকে বিশ শতকে এসে অনেকখানিই পাল্টে দিয়েছেন আইনস্টাইন।

আইনস্টাইন জন্মেছিলেন জার্মানীর উল্‌ম্‌ শহরে ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ। মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে "আইনস্টাইনের আবিষ্কার" নামে একটি প্রবন্ধের শুরুতে আমি বলেছিলাম ঃ "সাধারণ মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে ঘিরে আছে এক রহস্যের জগৎ।......তাদের কাছে তিনি এমন এক অঙ্কের জাদুকর যিনি বলেন ঃ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চতুর্থমাত্রা বলে একটা জিনিস আছে। আশেপাশের সব জিনিস সময়বিশেষে খাট হয়, লম্বা হয়; দুনিয়াটা বেলুনের মত চুপসে যায় আর ফুলে-ফেঁপে ওঠে......আর আইন-স্টাইনের এই কিম্ভূত বিচিত্র আপেক্ষিক জগৎ থেকে একদিন হঠাৎ বেরিয়ে আসে আণবিক বোমার প্রলয় হুঙ্কার।......"

আইনস্টাইনের বিপুল যুগান্তকারী আবিষ্কার, বস্তুজগতের রূপ

সম্পর্কে যে নতুন আলোক তিনি দেখিয়েছেন, তাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয় ; মানুষ হিসেবেও তিনি জগৎ আর সমাজ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

আইনস্টাইন বেঁচেছিলেন ৭৬ বছর। জীবনকালেই লাভ করেছিলেন বিপুল সম্মান। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো ঘটেছিল জীবনের প্রথম অর্ধেক সময়ের মধ্যে। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ করেন তিনি ১৯০৫ সালে—তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬ বছর। এই তত্ত্বেই প্রকাশিত হল তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত : সকল গতিই আপেক্ষিক, তবে উৎসের গতি যাই হোক আলোর বেগ ধ্রুব। এই একই বছরে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত ফটো-ইলেকট্রিক প্রভাবের তত্ত্ব (যার জন্যে এর ১৬ বছর পরে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়)। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে তিনি দেখালেন, বস্তু আর শক্তি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় অতি ভিন্ন ধরনের সত্তা বলে মনে হলেও আসলে তারা মূলত একই। বস্তু আর শক্তির অভিন্নতার সূত্রটিও আশ্চর্য সহজ একটি সমীকরণের সাহায্যে তিনি প্রকাশ করলেন। আইনস্টাইন মহাকর্ষ সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত-বহ আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন প্রথম মহাযুদ্ধের কালে—১৯১৬ সালে।

সে সময়ে আইনস্টাইনের এসব মতামত যুগান্তকারী বলে মনে হলেও সাথে সাথেই সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ বা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ সহজ ছিল না। বলা বাহুল্য, ফটো-ইলেকট্রিক প্রভাবের তত্ত্ব পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বলেই সে সময়ে নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁর অন্য যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোর ওপরে একেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

আমরা সাধারণ মানুষ স্থান বা কালের চরিত্র নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না ; কেননা এগুলোকে আমরা চিরাচরিত সত্য বলে গ্রহণ করি। আইন-স্টাইন তা করেন নি। তিনি স্থান-কালের চরিত্র নিয়ে তুলেছেন মৌলিক প্রশ্ন। এই নিরন্তর চলমান বিশ্বে কোন স্থান, কোন দর্শকই কি সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট, স্থির ; কোন গতিই কি পর-নিরপেক্ষ? আইনস্টাইন দেখিয়েছেন আমাদের স্থানের পরিমাপ নির্ভর করে দর্শকের অবস্থানের ওপর ; কালের বেলাতেও তাই।

মাত্র ষোল বছর বয়সেই আইনস্টাইনের মনে দেখা দিয়েছিল এই অদ্ভুত সমস্যাঃ "আমি যদি দৌড়ই একটি আলোর রশ্মির সাথে সাথে সমান বেগে তাহলে সে রশ্মিকে কেমন দেখাবে, কত মনে হবে তার বেগ?" তখন তিনি এর জবাব ভেবেছিলেন "মনে হবে একটা বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ স্থির, গতিহীন হয়ে আছে।" কিন্তু পরে তিনি দেখলেন এটা অসম্ভব। গতি না থাকলে তো থাকে না আলোর স্পন্দন বা শক্তি, থাকে না আলোর অস্তিত্বই। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন আসলে বিশ্বে আর সব কিছুর গতি আপেক্ষিক হলেও আলোর বেগ অন্য-নিরপেক্ষ ধ্রুব। দর্শকের বেগ যাই হোক আর যেভাবেই মাপা হোক, আলোর বেগ সব সময় একই পাওয়া যাবে।

এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত থেকে গণিতের সিঁড়ি বেয়ে আইনস্টাইন আরো যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন সেগুলোও আপাত-অসম্ভব মনে হয়ঃ

—স্থান পরিবর্তিত হতে পারে কালে, তেমনি কাল স্থানে।

--বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করা যায়, শক্তিকে বস্তুতে।

—দর্শক যদি ছোটে প্রায় আলোর বেগে তাহলে স্থান সংকুচিত হয়, কাল প্রসারিত হয়, বস্তুর ভর বাড়ে।

—আলোর সমান বেগে ছুটলে স্থান সংকুচিত হয়ে শূন্যে এসে দাঁড়ায়, কাল বেড়ে হয় অনন্ত, আর বস্তুর ভর হয়ে দাঁড়ায় অসীম।

অসীম ভরের বস্তুকে নড়াতে হলে অসীম শক্তির যোগান চাই ; কাজেই কোন বস্তুর পক্ষেই আলোর সমান বেগ অর্জন সম্ভব নয়। আলোর ভর নেই, তাই আলো ছুটতে পারে আলোর বেগে। অর্থাৎ আলোক-কণিকা বা ফোটনের বিচিত্র জগতে স্থান শূন্য আর কাল সীমাহীন।

আইনস্টাইনের নানা বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের একটি হল দ্রুতবেগবান অবস্থায় সময়ের মন্থরতা। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয় এভাবেঃ দু'জন যমজ নভোচারীর একজন যদি অপেক্ষা করে পৃথিবীতে আর অন্যজন আলোর কাছাকাছি বেগে দীর্ঘ সময় ঘুরে বেড়ায় মহাশূন্যে নক্ষত্রলোকে তাহলে সে পৃথিবীতে ফিরে এলে দেখবে তার পৃথিবীর সঙ্গী বুড়িয়ে গিয়েছে অথচ সে রয়েছে তরুণ।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কোন চলন্ত বস্তুর দিক বা বেগ পরিবর্তনের একটা প্রধান কারণ হল মহাকর্ষ। কাছে অন্য বস্তু বা মহাকর্ষের উপস্থিতি না ঘটলে চলন্ত বস্তু একই বেগে সরল রেখায় চলতে থাকে। আইনস্টাইন বললেন, অন্য বস্তুর উপস্থিতিতে আসলে স্থানের প্রকৃতিই যায় বদলে, তাই চলন্ত বস্তুর পথ যায় বেঁকে। বস্তুর উপস্থিতিতে স্থানের

এই অন্তর্নিহিত বক্রতার জন্যেই সূর্যের চারপাশে ঘোরে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ। অর্থাৎ আইনস্টাইনের জগতে দু'টি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি অদৃশ্য হয়ে গেল ; দেখা দিল ভারি বস্তুর কাছাকাছি স্থানের নিজস্ব বক্রতা।

আইনস্টাইন এক সুস্থিত নিয়মের জগতে বিশ্বাসী ছিলেন ; তাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনির্দেশ্যতা তাঁর পক্ষে মেনে নিতে কষ্ট হয়েছে। তিনি বার বার বলেছেনঃ "স্রষ্টা অনির্দিষ্ট সম্ভাবনার পাশা খেলা নিয়ে মেতে আছেন এটা বিশ্বাস করা শক্ত।" দর্শকের অবস্থান নির্বিশেষে সকল প্রসঙ্গ কাঠামোতে প্রকৃতির নিয়ম যাতে একই বলে মনে হয় এই ছিল তাঁর সাধনার প্রধান লক্ষ্য। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর তত্ত্বকে আসলে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব না বলে 'পরস্পর-নির্ভরশীলতার তত্ত্ব' বলাই সংগত।

আসলে তো আইনস্টাইনকে দুর্জ্ঞেয়তার অপবাদ দেয়া হলেও বিশ্বকে জটিল তত্ত্বের জালে জড়িয়ে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় করে তোলা মোটেই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বরং চেয়েছিলেন প্রকৃতই যে বিশ্ব দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, তাকে কতকগুলো সহজ তত্ত্ব আর সূত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে স্বচ্ছ আর স্পষ্ট করে তুলতে। তাঁর সময়ে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কৌশলের মান যে পর্যায়ের ছিল তার সাহায্যে তাঁর অনেক তত্ত্ব পরীক্ষা করে দেখা আদৌ সম্ভব ছিল না।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষানির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৯ সালে। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের যে বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে তার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, মহাকর্ষ শক্তি আসলে চৌম্বক ক্ষেত্রের মত ব্যাপ্ত এক ধরনের ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের প্রভাবে আলোর পথও সরল না হয়ে বেঁকে যেতে পারে। ১৯১৯ সালের ২৯শে মে তারিখে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ফটো তুলে দেখা গেল সূর্যের আশেপাশের তারার অবস্থান সত্যি মনে হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে ভিন্ন, আর তাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল তারার আলোর পথ বেঁকে গিয়েছে সূর্যের অবয়বের পাশ দিয়ে আসতে।

পরবর্তীকালে উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে। বিশাল বেতার-দূরবীণের সাহায্যে বহু কোটি আলোকবর্ষ দূরের স্পন্দনশীল বেতার উৎসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে এমন অবিশ্বাস্য আকর্ষণ শক্তি-ময় কৃষ্ণ গহ্বরের সন্ধান—যার কাছাকাছি পৌঁছলে সকল বস্তু, এমন কি

আলোও হারিয়ে যায় অতল অন্ধকারে, পরমাণু-ঘড়ির সাহায্যে আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় সময় মাপবার উপায় উদ্ভাবনের ফলে মহাকর্ষ ক্ষেত্রে আলোর গতিপথের সামান্যতম ব্যতিক্রমের খবর নেয়া আজ সম্ভব হয়ে উঠেছে। আর বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে বস্তু আর শক্তির অভিন্নতার সমীকরণের বাস্তব প্রয়োগ দেখা দিয়েছে আণবিক শক্তির উদ্ভাবনের মধ্যে।

আইনস্টাইনের সময়ে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কৌশলের নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কিন্তু তা বলে একথা মনে করলে বোধহয় ভুল করা হবে যে, তিনি এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন জগতের পথ খুলে দিয়েছেন। আসলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বড় রকম আবিষ্কারই সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর নয়। বিশ্বের নতুন নতুন রহস্য আবিষ্কার অনেকটা পর্বতের চূড়া লঙ্ঘন করার মতো। আগেকার অভিযাত্রীরা যেসব চূড়া লঙ্ঘন করেছেন তার ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই পরবর্তী অভিযাত্রী শুরু করেন নতুন চূড়া লঙ্ঘন করার যাত্রা। আইনস্টাইনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আলোর গুচ্ছ কণিকা হয়ত তিনি না জন্মালেও একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হত। কোন বস্তু বা সঙ্কেত যে আলোর বেগের চেয়ে দ্রুতগতি লাভ করতে পারে না এ তত্ত্ব অথবা বস্তু আর শক্তির অভিন্নতার সমীকরণও চিরকাল মানুষের অজানা থাকত—একথা বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু এসব আবিষ্কার অন্য কেউ করেননি। করেছেন আইনস্টাইন। যে আইনস্টাইন স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব একটা ভাল ছাত্র বলে বিবেচিত হননি। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরি জোটেনি, তাই চাকরি নিয়ে-ছিলেন পেটেন্ট অফিসে। বার বার তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে জাতীয়তা বদলাতে হয়েছে। মহাযুদ্ধের বিভীষিকা তাঁকে নির্মমভাবে পীড়িত করেছে। সেই আইনস্টাইনই করেছেন এসব অভিনব তত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবন। এগিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা। পাল্টে দিয়েছেন বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা। তার সময়ের চেয়ে আগেই। কেননা এসব ধারণা গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের আরো অসংখ্য আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের ফলে আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যতটা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর সময়ের বিজ্ঞানীদের কাছে অতটা হয়নি।

কিন্তু আইনস্টাইন একজন বড় বিজ্ঞানী আর সৃষ্টিশীল উদ্ভাবক হিসেবে

যেমন বড় তেমনি বড় মানুষ হিসেবে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত একজন সমাজ সচেতন দার্শনিক ও কর্মী হিসেবে। বিজ্ঞানের নানা বিস্ময়কর আবিষ্কার করেই শুধু তিনি ক্ষান্ত হননি, সেই আবিষ্কারের ফলাফল, আবিষ্কারের প্রয়োগ-পদ্ধতি আর মানব সভ্যতার ওপর তার প্রভাব সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সমান চিন্তিত।

তাঁর যে তত্ত্বের আবিষ্কার তাঁর জীবনকালেই ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে তাই আবার তাঁকে পীড়া দিয়েছে সব চাইতে বেশি। জার্মান বিজ্ঞানীরা সম্ভবত আণবিক শক্তির ওপর গবেষণা করছেন একথা জানতে পেরে তিনি ১৯৩৯ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি চিঠি লেখেন। খুব সম্ভব এই চিঠিই মার্কিন সরকারকে আণবিক শক্তি সম্পর্কে তৎপরতা শুরু করতে প্রবুদ্ধ করে। এর ফলে গভীর গোপনীয়তায় সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গবেষক দলের পক্ষে ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে প্রথম স্বয়ং-নির্ভর পারমাণবিক শৃঙ্খল-বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ বেগবান নিউট্রন কণিকার আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র ভাঙ্গার ফলে বিচ্ছুরিত নতুন নিউট্রন আপনা থেকেই নতুন নতুন পরমাণুর বিভাজন ঘটাতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষা ঘটায় ১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে। আর তার পর পরই জাপানের ওপর আণবিক বোমা ফেলা হয় ৬ই ও ৯ই আগস্ট।

বলা হয়ে থাকে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে এই প্রলঙ্কর বিধ্বংসী বোমা ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আইনস্টাইন এবং তাঁর সাথে আরো বহু বিজ্ঞানী এ ব্যাখ্যা মানতে পারেননি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এর বেশ কয়েক মাস আগেই জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে। জার্মানীর পতনের পর জাপানের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আর আদৌ সম্ভব ছিল না এবং এই ভয়াবহ বোমার বিস্ফোরণ না ঘটলেও জাপানের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

আইনস্টাইন নাৎসী জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ আর যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরোধিতা করেছেন গোড়া থেকেই। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতেই তিনি এই যুদ্ধের বিরোধিতা করে একটি সাহসিক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে তিনি রোমা রোলাঁ-কে একটি চিঠিতে লেখেন : "ভাবীকালের মানুষ যখন ইউরোপের কীর্তির কথা বিবেচনা করবে তখন কি আমরা তাদের একথা বলার সুযোগ দেব যে, তিন শতকের সাংস্কৃতিক অগ্র-

গতির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমরা এগোতে পেরেছি অন্ধতা থেকে জাতীয়তার বাতুলতার স্তর পর্যন্ত—তার বেশি কিছু নয়?”

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশন্সের শান্তি প্রচেষ্টার উদ্যোগ যখন ব্যর্থতার সম্মুখীন হল, আবার দুনিয়ায় শুরু হল যুদ্ধের পাঁয়তারা তখন ১৯৩১ সালে তিনি বলেছিলেন: “আমি শুধু শান্তিবাদী নই, আমি শান্তির সৈনিক। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি লড়তে প্রস্তুত। জনসাধারণ যদি যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি না জানায় তাহলে কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না।...........”

এমনি দৃঢ় শান্তিবাদী হয়েও তিনি কেন আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন একথা ভেবে আইনস্টাইন চিরকাল দুঃখ পেয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, জার্মানী আণবিক বোমা তৈরি করতে পারবে না একথা জানা তাঁর পক্ষে আগে থেকে মোটেই সম্ভব ছিল না, জানলে তিনি নিশ্চয়ই এমন পরামর্শ কখনো দিতেন না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে যে “ঠান্ডা লড়াই” এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হল এতেও আইনস্টাইন অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের দিকে তিনি শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ হয়ে ওঠেন। এ সময়ে তিনি একবার গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, “আমি যদি আবার তারুণ্য ফিরে পেতাম আর জীবিকা বেছে নিতে পারতাম তাহলে আমি বিজ্ঞানী, পন্ডিত বা শিক্ষক হতে নিশ্চয়ই চাইতাম না। তার চেয়ে বরং আমি চাইতাম একজন পানির কলের মিস্ত্রি অথবা ফেরিওয়ালা হতে, এই আশায় যে বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব পেশায় হয়ত এখনও সামান্য কিছুটা স্বাধীনতার সুযোগ আছে।”

কিন্তু তবু তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। একেবারে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আইনস্টাইন ছিলেন না। ১৯৫৫ সালের শুরুতে তিনি আর বারট্রান্ড রাসেল মিলে ঠান্ডা যুদ্ধ যাতে পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ না নেয় তার বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে ১৯৫৫ সালের ১১ই এপ্রিল তিনি আর রাসেল আরো ৯ জন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর সাথে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তারই ফল হিসেবে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান ও বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে প্রথম পাগ্ওয়াশ সম্মেলন। আইনস্টাইন এই প্রথম সম্মেলন

দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই পাগওয়াশ আন্দোলন আজো সক্রিয় রয়েছে।

সেই বিখ্যাত রাসেল-আইনস্টাইন ঘোষণাপত্রে অংশত বলা হয়েছিল ঃ "...........,সাধারণ মানুষ, এমন কি যাঁরা ক্ষমতার আসনে আসীন তাঁদেরও অনেকে এখনও বুঝতে পারছেন না পারমাণবিক যুদ্ধের ফলাফল কি হতে পারে। সাধারণ মানুষ এখনও মনে করে শুধু কিছু শহর ধ্বংস হবে। তারা জানে এই নতুন বোমা আগেকার বোমার চেয়ে শক্তিশালী ; একটি পরমাণু বোমা হিরোশিমা শহর ধ্বংস করতে পারে, হাইড্রোজেন বোমা ধ্বংস করতে পারে বড় বড় নগর যেমন লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো।.........(কিন্তু তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে) যুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমার ব্যবহার সমগ্র মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। আমাদের আশঙ্কা এই যে, যুদ্ধে অনেক হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহৃত হলে পৃথিবীতে সর্বজনীন মৃত্যু নেমে আসবে—অল্প সংখ্যক মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু অধিকাংশের মৃত্যু ঘটবে ধীরে ধীরে, ব্যাধি ও অপচয়ের তীব্র যাতনার মধ্য দিয়ে।......

"যদি আমরা যথার্থভাবে বেছে নিতে পারি, তাহলে আমাদের সামনে রয়েছে আনন্দ, জ্ঞান আর প্রজ্ঞার অব্যাহত যাত্রা। কিন্তু তার পরিবর্তে কলহ মীমাংসায় ব্যর্থতার ফলে আমরা কি বেছে নেব মৃত্যু? মানুষ হিসেবে আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ঃ আপনাদের মানবতার কথা মনে করুন, ভুলে যান আর সব কিছু। যদি তা করতে পারেন তাহলে আপনা-দের সামনে খোলা রয়েছে এক নতুন স্বর্গের পথ ; যদি তা না পারেন তাহলে আপনাদের সামনে রয়েছে সর্বজনীন মৃত্যুর সমূহ বিপদ।"

মৃত্যুপথযাত্রী আইনস্টাইনের এই বেদনাকাতর আকুল আবেদন আজ সিকি শতাব্দী পরেও অনুরণিত হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের কানে। তাঁর সকল যুগান্তকারী আবিষ্কারের ঊর্ধ্বে মানুষের জন্যে, সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যে যে ভাবনা তিনি প্রকাশ করেছেন তা তাঁকে করেছে একজন মহাবিজ্ঞানী শুধু নয়, এক মহৎ মানুষ।

আর আইনস্টাইন জন্ম শতবার্ষিকী পালনের এই দুনিয়া জোড়া আয়োজনে আজকের সব বিজ্ঞানী, সব মানুষ যদি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনার, মানুষের শান্তিময় ভবিষ্যতের সংগ্রামে তাঁর সহযাত্রী হবার তাহলেই হবে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা জানানো।

(মার্চ, ১৯৭৯)
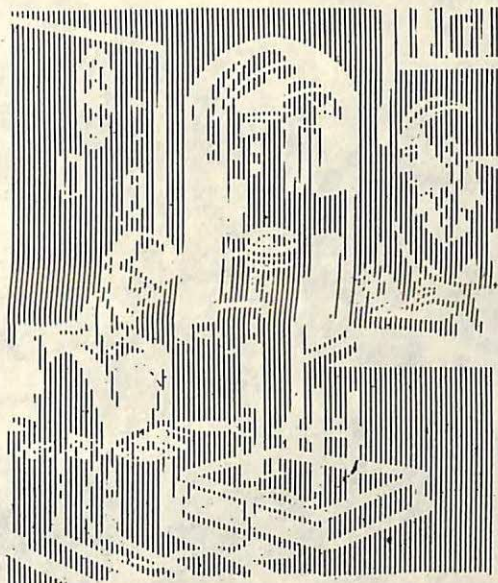
বিজ্ঞান আন্দোলন

এ যুগের বিজ্ঞান মানুষকে শুধু মুগ্ধ করে না, তাঁকে বিপুলভাবে আলোড়িতও করে। বিজ্ঞানের চর্চা জন্ম দেয় নতুন আকাঙ্ক্ষার, বদলে দেয় মানুষকে, মানুষের সমাজকে। দেশে দেশে বিজ্ঞানের যে উদ্বেল অভিযান, বাংলাদেশ তার প্রভাবের বাইরে নয়; এদেশেও লেগেছে বিজ্ঞান আন্দোলনের ছোঁয়া।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন

অভিধান খুললে বিজ্ঞানের যে অর্থ চোখে পড়ে সে হল 'বিশেষ জ্ঞান' বা বিশেষভাবে আহরিত বিস্তারিত সুশৃঙ্খল জ্ঞান। এই অর্থ এবং এই ধারণা আমাদের দেশে এমনভাবে বদ্ধমূল যে, আহরিত তথ্যের একটা বিশাল সমাহার ছাড়া বিজ্ঞানকে আর কিছু বলে মনে করা আমাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই রীতিমতো শক্ত।

তাহলে থরে থরে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো অজস্র মূল্যবান তথ্যের ভান্ডার ছাড়া বিজ্ঞান আর কী?

অবশ্যই বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলী বিজ্ঞানের একটা অংশ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানীদের তথ্য-সন্ধানের, গবেষণার বিশেষ এক পদ্ধতি। যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে মানুষের সত্য-সন্ধানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। নানা অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ শিখেছে ঠিকমতো প্রশ্ন তুলতে, অনুসন্ধানের সমস্যাকে নির্দিষ্ট করতে, সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে ; সমস্যার আনুমানিক সমাধান বা প্রকল্প স্থির করতে, এই প্রকল্প পরীক্ষার জন্যে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের আয়োজন করতে ; ফলাফল বিশ্লেষণ করতে ; এবং সবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

এই অর্থে বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়, বিজ্ঞান এক পদ্ধতিরও নাম। এই পদ্ধতি হল অনুসন্ধান, গবেষণা। এই পদ্ধতির অঙ্গীভূত হল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। তাকে বলতে পারি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মের ওপর বিশ্বাস। মানুষের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস। প্রকৃতিকে জানবার, জয় করবার সংগ্রামে হার না মানা। কল্পনায় নির্ভর না করে পরীক্ষিত সত্যের ওপর, তথ্য আর যুক্তির ওপর নির্ভর করা। এই পদ্ধতিকে

আয়ত্ত না করে, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মস্থ না করে, শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করলে তাকে বিজ্ঞান-চর্চা বলা যাবে না।

বিজ্ঞানের অর্থের মতোই আর একটি ধারণা আমাদের দেশে গেড়ে বসে আছে। সে হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে শুধু গুটিকয়েক প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর সাধনার ওপর। কথাটা শুধু অংশত গ্রহণযোগ্য।

এটা সত্যি যে গুটিকতক বিশেষ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন। কখনো কখনো তাঁরা আমূল পালটে দেন মানুষের পুরনো দিনের ধ্যান-ধারণা। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, তাঁদের আবিষ্কারও সম্ভব হয় আরো অসংখ্য বিজ্ঞানীর অজস্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। বহু বিজ্ঞানী মিলে প্রকৃতির খন্ড খন্ড নিয়ম উদ্‌ঘাটন করার ফলেই সম্ভব হয় কোন বিশেষ ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানীর পক্ষে এমনি সব নানা সিদ্ধান্তকে যুক্তির মালায় গেঁথে এক বড় অখন্ড সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

আসলে আমাদের দেশ আজ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে এ দেশের অগ্রগতির জন্যে বা অর্থনীতির বিকাশের জন্যে কোন অসাধারণ বড় রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন যতটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার বিস্তার। কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ যাবৎ যে সব আবিষ্কার ঘটেছে তার মূল নীতিগুলো আমাদের দেশের কৃষি সমস্যায় যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের ফসলের উৎপাদন বাড়তে পারে তিন-চার গুণ। জীবাণুতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে, পরিবেশ সম্বন্ধে যেসব তথ্য মানুষের জানা সেগুলোকে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের চেহারা বদলে যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে পারে বস্তুসম্পদের প্রাচুর্য, জীবনযাত্রার মান বাড়তে পারে যথেষ্ট পরিমাণে।

সারা দেশব্যাপী মানুষের জীবনে ব্যক্তিক ও সংগঠিত বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ সম্ভব নয় শুধু প্রতিভাধর ক'টি মানুষের বিজ্ঞানচর্চায়। তার জন্যে প্রয়োজন সারা দেশকে বিজ্ঞান-মনা করে তোলা। বিজ্ঞানের আন্দোলনে অঙ্গীভূত করা দেশের নানা স্তরের মানুষকে। সারা দেশে অনুসন্ধিৎসার, পরীক্ষণের বীজ বপন করা। অনুসন্ধানের পদ্ধতি অর্থাৎ বিজ্ঞানের পদ্ধতির চর্চা করা। জীবনের সকল স্তরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনের নানা সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান খোঁজা।

বলাই বাহুল্য, এ আন্দোলন প্রথমে ছড়াতে হবে তরুণ সমাজের মধ্যে। এককালে এদেশের ছাত্র-তরুণরা ভাষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল দেশের সর্বস্তরের মানুষকে। আজ তেমনি প্রয়োজন বিজ্ঞানের আন্দোলন। বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলন। বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন। বৈজ্ঞানিক জীবনবোধের আন্দোলন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আন্দোলন আর জাতি গঠন বা দেশ গঠনের আন্দোলনে কোন ভেদ নেই। ছাত্র-তরুণ সমাজের মাধ্যমে এই আন্দোলনের অংশীদার করতে হবে দেশের সকল কৃষক, শ্রমিক, উৎপাদনশীল মানুষকে। সারা দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানবোধের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্নশীলতা ও বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার উৎকর্ষ ছাড়া দেশ গঠনের দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এমনি বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার একটি উপায় হল দেশময় বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন। এসব বিজ্ঞান ক্লাব হল মোটামুটি একমনা অনুসন্ধিৎসু কিশোর-কিশোরীদের বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা পাঠক্রমের বাইরে স্বচ্ছন্দ আনন্দময় বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। এমনি ক্লাব গড়ে উঠতে পারে বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক—যেমন, রেডিও ক্লাব, পদার্থবিদদের ক্লাব বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্লাব। অথবা হতে পারে বিজ্ঞানের নামে নানা দিকে উৎসাহীদের সমাবেশে বহুমুখী বিজ্ঞানের ক্লাব।

সচরাচর এমনি ক্লাবের সাথে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান শিক্ষক যুক্ত থাকলে ক্লাবের কাজে সহায়তা ঘটে। বিদেশে পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে এমনি ক্লাবের সদস্য ছেলেমেয়েরা সাধারণত স্কুলের বিজ্ঞান পাঠেও ভাল ফল করে। এছাড়া তাদের মধ্যে দেখা যায় উদ্যোগ ও সংগঠনমুখিতা, অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনের প্রবণতা। এর ফলে নিজ নিজ উৎসাহের ক্ষেত্রে তাদের গভীরতর চর্চার সুযোগ ঘটে। তাছাড়া এতে ভবিষ্যতে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশেরও ক্ষেত্র তৈরি হয়।

বিজ্ঞান ক্লাব তার সদস্যদের প্রবণতা বা উৎসাহ অনুযায়ী হতে পারে নানা ধরনের। বিভিন্ন ধরনের শখের নেশা যাদের তাদের নিয়ে হতে পারে শৌখিন কাজের কেন্দ্র, যেমন, ফটোগ্রাফী, বেতার বা ভ্রমণ হতে পারে তাদের প্রধান কর্মসূচী। আবার পড়ুয়া ধরনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হতে পারে পড়ুয়া বিজ্ঞানীদের ক্লাব। তাদের কাজ হতে পারে স্কুলের বাইরে প্রধানত স্কুলের পড়া বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের চর্চা। আবার হতে পারে

আলোচনা-চক্র, জাতীয় ক্লাব যেখানে প্রধানত নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ডেকে এনে তাঁদের কাছে শোনা যায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের বিস্ময়কর অগ্রগতির খবর, আর তা থেকে উদ্দীপ্ত হয় তরুণ বিজ্ঞানীদের মন। এ ছাড়া হতে পারে কারিগরি ধরনের ক্লাব, যেখানে প্রধান জোরটা থাকে হাতে-কলমে কাজের ওপরে আর বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জানার এবং সে বিষয়ে প্রস্তুতির ওপরে।

অবশ্য বহুমুখী বিজ্ঞান ক্লাবে ঘটতে পারে এ সবকিছুরই সমন্বয়। তার কর্মসূচীতে সব ধরনের ছেলেমেয়েই নিজ নিজ উৎসাহ অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা নিজেরা হাতে-কলমে কাজে উৎসাহী নয় তারাও অন্যদের জন্যে 'আইডিয়া' দিতে পারে, তাদের কাজের ওপর আলোচনা-সমালোচনা করতে পারে। আদতে তো বিজ্ঞান ক্লাব শুধু তথাকথিত 'ভাল ছাত্র'-দের জন্যে নয়। বিজ্ঞান ছুঁয়ে যায় আজকের সমাজের সব মানুষের জীবনকে। কাজেই বিজ্ঞান ক্লাবে বিজ্ঞানে উৎসাহী সব ছেলেমেয়েদেরই সমাবেশ ঘটা দরকার। তার অর্থ এই নয় যে, তাদের সবাইকে বড় হয়ে বিজ্ঞানী হতে হবে।

তাছাড়া এক ব্যাপক বিজ্ঞান আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখলে বিজ্ঞান ক্লাবকে দেখতে হবে বিজ্ঞানমনা উৎসাহী কিশোর-কিশোরী এবং সমগ্র জনসমাজের মধ্যে একটি মূল্যবান যোগসূত্র হিসেবে। এদের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান। গড়ে উঠতে পারে বিজ্ঞানের পরিপোষক দৃষ্টিভঙ্গী, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের কুশলতা। আর আগেই আমরা বলেছি, সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রয়োগ ছাড়া আজকের দিনে জাতীয় অগ্রগতির প্রত্যাশা কল্পনা বিলাসিতা বই কিছু নয়।

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মধারা নির্ভর করবে স্বভাবতই তার উদ্দেশ্যের ওপরে। বহুমুখী বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্যের মধ্যে আসতে পারে (ক) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা ; (খ) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কাজের অভিজ্ঞতা ; (গ) যুক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতি অভ্যাস করা ; (ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক শৌখিন কার্যকলাপ এবং (ঙ) প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশে সহায়তা।

এসব লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, তার মধ্যে পড়েঃ—

১. বিজ্ঞানের নানা বিভাগে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করা।

২. আমাদের দেশের নানা বাস্তব সমস্যা নিয়ে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল ও আগ্রহ অনুযায়ী বিজ্ঞানের প্রজেক্ট বা গবেষণা গ্রহণ করা। এ জন্যে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান শিক্ষকদের সহায়তা বিশেষ কাজে আসতে পারে।

৩. গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করে গবেষণাপত্র পাঠ ও তার ওপর আলোচনা।

৪. বিজ্ঞান মেলা বা প্রদর্শনী। এগুলি স্কুলভিত্তিক, শহরভিত্তিক, ক্লাবভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক বা জাতীয়ভিত্তিক হতে পারে।

৫. ক্লাবের দেয়াল পত্রিকা বা অন্য ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ।

৬. অ্যাকোয়ারিয়াম, পক্ষীশালা বা পশুশালা রক্ষণাবেক্ষণ।

৭. হবি বা শৌখিন ক্রিয়াকলাপ—যেমন, পোকামাকড় সংগ্রহ, ফুলপাতা সংগ্রহ, যন্ত্রপাতি তৈরি ইত্যাদি নানা ধরনের হাতের কাজ।

৮. বিজ্ঞপ্তি ফলক বা সংবাদ ফলকের মাধ্যমে নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক খবরাখবর ইত্যাদি প্রচার।

৯. স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম।

১০. বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনী।

বলাই বাহুল্য, একটি ক্লাব গড়ে উঠলে সেটা যে এর সবগুলো কার্যক্রম একই সঙ্গে শুরু করবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া কোন্ কোন্ কার্য-ক্রম শুরু করা হবে তা অনেকটাই নির্ভর করবে সদস্যদের বয়স, অভিজ্ঞতা, অনুরাগ এবং পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধার ওপরে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান আজ যেমন শৈশবাবস্থায়, বলাই বাহুল্য, বিজ্ঞান ক্লাবেরও তেমনি কেবল শুরু। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য যেমন দেশের মাত্র গুটিকতক মানুষের সামগ্রী নয়, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও রয়েছে প্রচ্ছন্ন গভীর শিল্পচেতনা, তেমনি বিজ্ঞানও শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, শহর-বাসী মানুষের চর্চার উপকরণ নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে যেদিন বিজ্ঞানের দৃঢ় অধিষ্ঠান ঘটবে সেদিন দেশের প্রবল, সুনিশ্চিত অগ্রগতি কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

আশার কথা এই যে, দেশময় আজ এই পরিবর্তনের ধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অনুভূতি ও আবেগনির্ভর সংস্কৃতির পাশাপাশি অনুসন্ধান, বস্তুনিষ্ঠা ও কর্মনির্ভর সংস্কৃতির চর্চা তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করছে। বিজ্ঞান আজ কেবল পুঁথির পাতায় আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ছে নিরীক্ষা, আবিষ্কার ও প্রয়োগের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে।

বিজ্ঞানমুখিতা কেবল শ্লোগান হিসেবে নয়, দেশময় সঞ্চারিত হোক সুসংবদ্ধ কর্মধারায়। অসংখ্য বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে সংগঠিত হোক বিজ্ঞানমনা কিশোর-কিশোরীদের কর্মশক্তি। আর তা সঞ্জীবিত করুক এদেশের মানুষের আত্মবিকাশের, নতুন সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের বিশাল সম্ভাবনাকে।

বিজ্ঞান সন্ধানীর ভূমিকা

০ ০

লেখাটার শিরোনাম লিখে প্রায় সাথে সাথেই সেটা আবার কেটে দিতে যাচ্ছিলাম। এই শিরোনাম থেকে মনে হতে পারে আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে রয়েছে যাদের বলা যেতে পারে 'বিজ্ঞান সন্ধানী'—আর তাদের ভূমিকার কথা আলোচনাই এই লেখার উদ্দেশ্য। কিন্তু আদতে তো সব ছেলেমেয়েই কিছু-না-কিছু পরিমাণে বিজ্ঞান সন্ধানী। আর আমাদের দেশে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে পড়ে এরকম ছেলেমেয়ের সংখ্যা অন্তত এক কোটির ওপর। এই বয়সের অথচ স্কুলে পড়ে না এমন ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও প্রায় এমনি হবে।

একথা ভেবে শিরোনামটা পালটে ফেলে লিখতে যাচ্ছিলাম "লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞান সন্ধানী"। তখন আবার মনে হল কিন্তু এও কি আমাদের দেশের জন্যে পুরোপুরি সত্যি হবে? এই লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে হয়ত হয়ে উঠতে পারে বিজ্ঞান সন্ধানী, কিন্তু এখনও হয়নি কথাটার পুরোপুরি অর্থে। তাদের বিজ্ঞান সন্ধানী হবার জন্যে সাহায্যের দরকার।

এমনি দোটানায় পড়ে ওই সাদামাটা শিরোনামটা আর পাল্টানো হল না।

কাকে বলব আমরা বিজ্ঞান সন্ধানী?

বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ায় রয়েছে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা, অজানাকে জানার ইচ্ছা আর চেষ্টা। এটা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি, অর্থাৎ এ তাকে কসরত করে শিখতে হয় না। এমন ছেলে বা মেয়ে পাওয়া শক্ত হবে যার আশেপাশের সবকিছু সম্বন্ধে জানবার প্রবল কৌতূহল নেই। অতি ছোট শিশু যখন আগুনের শিখায় হাত দিয়ে বোঝে যে ব্যাপারটা মোটেই আরামের নয়, কিংবা হাতের কাছে পাওয়া কাঠের টুকরো বা আর কিছু মুখে পুরে পরখ করার চেষ্টা করে তখন সে আসলে তার আশেপাশের প্রকৃতি-টাকে জানতে আর বুঝতে চাইছে।

এখানে হয়ত প্রশ্ন হবেঃ কিন্তু আমাদের পরিবেশ আর সমাজ কি পরিবেশকে জানার বা বোঝার এই প্রচেষ্টার পক্ষে অনুকূল? বলাবাহুল্য,

জবাবে খুব উৎসাহের সাথে 'হ্যাঁ' বলা শক্ত। হাতে-কলমে সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখায় পদে পদে বাধা। স্বাধীন অনুসন্ধানের পথ রোধ করার জন্যে বড়দের শাসন অতি সহজেই খড়্গহস্ত। ছোট শিশু কোন কিছু ধরতে গেলে শুনতে হবেঃ "ছুঁয়ো না, ভাঙবে।"—কোন কিছু দেখতে গিয়ে যদি হঠাৎ ভাঙল তবে বড়রা প্রায়ই এমন মারমুখো হয়ে ওঠেন যেন এই বিদ্রোহীটাকে ভালমত শায়েস্তা না করলে তাঁদের জীবনে শান্তি ফিরে আসবে না!

কৌতূহল, অনুসন্ধান আর অভিজ্ঞতা থেকেই সকল জ্ঞানের উদ্ভব। যেমন ভাল জ্ঞান, তেমনি মন্দ জ্ঞান। যেমন জ্ঞান, তেমনি মনোভঙ্গী। নানা প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে, বড়দের নানা মুখনাড়া আর ভ্রূকুটি দেখতে দেখতে অনেক ছেলেমেয়েই ক্রমে ক্রমে বুঝতে শেখে বেশি কৌতূহল ভাল নয়, বেশি প্রশ্ন তোলাও মরুব্বিরা পছন্দ করেন না। দুনিয়াটা যেমন আছে তেমনি একে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়াই ভাল, বেশি ঘাঁটাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বেশি বোঝার চেষ্টাও নিরর্থক। নতুন কোন মত প্রকাশ বা বা নতুন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা শুধু মিথ্যে ঝকমারি বাড়ানো!

অথচ উন্নতি মানেই তো পরিবর্তন। যদি চাই স্বাস্থ্যের উন্নতি তাহলে স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা থেকে আরো ভাল অবস্থা চাই। চাষবাসের উন্নতি ঘটাতে হলে চাই আরো ভাল চাষের ব্যবস্থা। দেশের উন্নতি আদৌ সম্ভব নয় পরিবেশের পরিবর্তন ছাড়া। তা বলে যে কোন পরিবর্তন মানেই উন্নতি নয়। পরিবর্তন হতে পারে বাঞ্ছিত অথবা অবাঞ্ছিত। বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে হলে পরিবর্তনের নিয়মকানুন জানতে হবে। জানতে হবে কি করে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা যায়ঃ গাছপালায় পরিবর্তন, চাষবাসের পরিবর্তন, উৎপাদনের পরিবর্তন, স্বাস্থ্যের পরিবর্তন, প্রকৃতিতে, মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন। তাছাড়া আরো জানতে হবে কি করে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঠেকানো যায়।

কারো কারো কাছে মনে হতে পারে এই পরিবর্তনের নিয়মকানুন শেখা তো বড় হয়েও আরম্ভ করা যাবে। জ্বী না, এই শিক্ষা শুরু করতে হবে ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলায়, যখন শিশুদের কৌতূহল প্রবল। যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিশু চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিপুল পরিমাণ বিষয়ে জানতে চেষ্টা করছে। যখন তৈরি হচ্ছে তার মগজ, স্নায়ু, তার মাংসপেশী, হাড়। যখন প্রতিটি অভিজ্ঞতা এসব গড়নে তাকে সাহায্য করছে বিপুলভাবে, এগিয়ে দিচ্ছে আরো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে। ঠিক তখনই হল এই কৌতূহলের নিবৃত্তির পথে এগোবার মস্ত সুযোগ। নতুন

নতুন অনুসন্ধান, নতুন নতুন প্রশ্ন, নতুন নতুন ভাবনা, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অভিজ্ঞতার এই হল সব চাইতে উপযুক্ত সময়।

এই শৈশবে, কৈশোরে ছেলেমেয়েদের দিতে হবে ঘরের ভেতরে আর বাইরে নানা জিনিস দেখবার, নাড়াচাড়া করবার অভিজ্ঞতা—যেন দেখবার ক্ষমতা তীক্ষ্ন থেকে তীক্ষ্নতর হয়, নাড়াচাড়া করবার দক্ষতা বাড়ে। দিতে হবে পরীক্ষা করবার আর আলোচনা করবার, নিজে নিজে পড়ে জ্ঞান আহরণ করবার সুযোগ। এসব সুযোগ তার দেহ আর মনকে বাড়তে সাহায্য করবে। উদ্বুদ্ধ করবে তার চিন্তাশক্তিকে। আর এভাবে জন্মাবে চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপলব্ধি। প্রকৃতির নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞান, আর সবচেয়ে বড় কথা—স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা।

সুস্থ জীবনের জন্যে যেমন দরকার দেহের খোরাক তেমনি চাই মনেরও খোরাক। প্রকৃতির নিয়মকানুন জেনে মানুষ ভয় আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রকৃতির সমগ্র কাঠামোয় তার স্থান কোথায়, কি করে ঘটছে আশেপাশের সব ঘটনা, কি করে মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে প্রকৃতির ঘটনার ওপরে—এসব জানলে জগৎটাকে আর তত রহস্যময়, অজ্ঞেয়, অনিশ্চিত মনে হয় না ; নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কায়দাকৌশল আয়ত্ত করা থেকেই জন্মায় মানুষের নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস। এমনি উপলব্ধির অঙ্গ হতে পারে বহু ধরনের বিষয় ; তার কটি নমুনা নেয়া যাক।

(ক) **নিত্য পরিবর্তন।** বিজ্ঞানের চর্চা থেকে কিশোর-কিশোরীদের মনে জগতের পরিবর্তনশীলতার ধারণা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ উপলব্ধি জন্মাতে পারে। এ জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়—একমাত্র পরিবর্তন আর রূপান্তর ছাড়া। মানুষ, প্রজাপতি বা পাহাড়-পর্বত সবকিছুই পড়ে এই পরিবর্তনের আওতায়। অথচ এই পরিবর্তন আমাদের কাছে অনেক সময় এলোমেলো, খাপছাড়া, ভীতিকর মনে হয়। না জেনে, না বুঝে আমরা এসব পরিবর্তন ঠেকাতে অনেক সময়, অনেক শক্তি ব্যয় করি। বৃষ্টির ফোঁটা, গাছের পাতা, প্রজাপতি সবকিছুরই ঘটছে রূপান্তর ; আর এসব রূপান্তর ঘটছে কতগুলো নিয়ম মেনে। বিজ্ঞানচর্চা থেকে এসব নিয়ম আমরা জানতে পারি। আর এই নিয়মকানুন জানলে তখন চারপাশের দুনিয়াটাকে আর অতটা এলোমেলো, খাপছাড়া, বুদ্ধির অগম্য বলে মনে হয় না।

(খ) **অনুভূতি আর বিশ্বাস।** বিজ্ঞান শুধু তথ্যের সমাহার নয়,

মানুষের মনে বিপুল অনুভূতিরও বিকাশ ঘটায়। সৌরজগতে পৃথিবী সূর্য থেকে পাচ্ছে কী বিপুল তাপ, কী বিশাল দূরত্ব গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে, কী প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে মহাশূন্যযান, আর তবু কী আশ্চর্য নিখুঁতভাবে পৌঁছয় বহু কোটি মাইল দূরের গ্রহান্তরে। পৃথিবী তার বিশাল হাওয়ার চাদর মুড়ি দিয়ে নিজের অক্ষের ওপর ঘুরছে দিন-রাতের কী আশ্চর্য নিয়মিত ছন্দের দোলায়। আজ থেকে হাজার বছর পরে এক-দিন ভোরে ঠিক কোন্ মুহূর্তে ভোর হবে এভারেস্ট শৃঙ্গে তাও আমরা আজ হিসেব করে বলতে পারি! এ থেকে মানুষের শক্তির ওপর ভরসা, নিয়মের ওপর বিশ্বাস গাঢ় হয় ; এমনি বিশ্বাস থেকেই জন্মায় জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা।

(গ) পৃথিবীকে বদলানো। জীবনে অনেক গ্লানি আছে, সীমাবদ্ধতা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে এগুলো অতিক্রম করতে। ব্যাধি আর দারিদ্র্যকে বিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী নিয়তি বলে মেনে নেয় না। অজানা জগৎ আবিষ্কার করতে, অন্ধকারে ঢাকা দুর্গম অপদেবতার আস্তানাকে কেড়ে নিতে বিজ্ঞানীরা পিছপা নন। বিপদ আর ভয়কে জয় করে তাঁরা এগিয়েছেন মানুষের কল্যাণে, পৃথিবীকে মানুষের জন্যে আরো বাসযোগ্য, আরো সুখময় করে গড়ে তোলার জন্যে।

(ঘ) পরিবেশের ভারসাম্য। চারপাশের প্রকৃতি থেকে মানুষ শেখে তার জীবনযাত্রার জন্যে প্রয়োজন নানা উদ্ভিদের, নানা প্রাণীর। প্রাণী আর উদ্ভিদের মধ্যেও একে অন্যের সহায়ক, একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশের এই ভারসাম্যের কথা জানলে আমরা পরিবেশকে এমন করে ব্যবহার করতে পারি যেন তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মানুষের জন্যে বিপদ ডেকে না আনে।

প্রকৃতির এমনি সব নিয়মকানুন জানা, নিয়মকানুন জেনে প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ আর অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর তারই মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আরো সুন্দর করে তোলা। এরই অন্য নাম হল সভ্যতা। বিজ্ঞান সন্ধানী না হয়ে কেউ কখনো সভ্যতার পথে এগোতে পারে না।

ইতিহাসে যত বিজ্ঞানী জন্মেছেন তার শতকরা নব্বুইজনই নাকি আজও জীবিত। অর্থাৎ আজকের দিনে যত বিজ্ঞানী বেঁচে আছেন এমন আর কখনো ছিলেন না ; আজকের বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ইতিহাসের আগের সব-

যুগের বিজ্ঞানীদের সংখ্যার যোগফলের চাইতেও অনেক বেশি।

একথাটা সত্যি বলে মেনে নিলেই কি আমাদের দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে? বিলেত, আমেরিকা, জার্মানী বা সোভিয়েত ইউনিয়নে অসংখ্য অতি উঁচুদরের বিজ্ঞানী আছেন। তাঁরা তাঁদের দেশে বিজ্ঞানের, উৎপাদনশক্তির, জীবনযাত্রার মানের বিপুল বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের লেখা অজস্র বইপত্র, গবেষণা পত্রিকা আছে। সে সবও মোটামুটি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে লভ্য। তবু কি বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা, শিল্প উৎপাদনের সমস্যার সমাধান হয়েছে?

সমাধান যে হয়নি তার সবচাইতে বড় কারণ আমাদের সমস্যার সমাধান বাইরের লোকে এসে করে দেবে না ; কোন দেশে কেউ করেনি। আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। সে জন্যে চাই আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকাশ। অনুসন্ধানের সুযোগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণার স্পৃহা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পাওয়া তত্ত্বকে চারপাশে আমাদের জীবনের কাজে, মানুষের কাজে প্রয়োগ।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রতিভা মানে কি কেবল গাদা গাদা ফরমুলা আর তত্ত্ব মুখস্থ করা, অসংখ্য বস্তুর গুণাগুণ, অসংখ্য নিয়ম আর সমীকরণ মনে রাখতে পারা?

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা হল বিজ্ঞানীর মতো চিন্তা আর কাজ। বিজ্ঞানীর মতো সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। নদী-নালা, গাছ-পালা, পোকামাকড়, কলকব্জা, জীবজন্তু, আকাশ-মাটি—সবই দেখতে হবে খুঁটিয়ে, নেড়েচেড়ে। খুঁটিয়ে দেখার জন্যে দরকার খুঁটিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। খুঁটিয়ে প্রশ্নের জবাব বের করা। জবাবগুলো গুছিয়ে বিশ্লেষণ করা। আলোচনা, বিতর্ক ; বিতর্ক থেকে সমাধানে পৌঁছানো। তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যে গড়ে তোলা চাই দেখার দক্ষতা, পড়ার দক্ষতা, পরীক্ষা করার দক্ষতা, আলোচনার দক্ষতা, সিদ্ধান্তে পৌঁছবার দক্ষতা। এ সবই দরকার বিজ্ঞান সন্ধানী আর বিজ্ঞানমনা হবার জন্যে।

সবচেয়ে বড় কথা হল স্বাধীনভাবে কাজ করার, নিজে নিজে পরীক্ষা করার, হাতে-কলমে কাজ করে সমস্যা সমাধান করার অভ্যাস গড়ে তোলা। ডিম থেকে মুরগীর বাচ্চা বেরোয় এ আমরা জানি। কিন্তু ছোট শিশুর জন্যে ডিমে তা দেয়ার ব্যবস্থা থেকে বাচ্চা ফোটা পর্যন্ত নিজে নিজে দেখার মতো আনন্দের ব্যাপার আর কিছু নেই। চুম্বক কোন কোন জিনিসকে আকর্ষণ করে এ আমরা জানি ; কিন্তু চুম্বক তামা, আর রুপোকেও কি

আকর্ষণ করবে?—হাতে-নাতে করে দেখলেই জানা যাবে একথার জবাব। ছোটরা হাতে-কলমে পরখ করে এমনি বহু সমস্যার জবাব নিজেরাই বের করতে পারে।

তা বলে ছোটদের বিজ্ঞান সন্ধানী হবার জন্যে বড়দের কি কোন ভূমিকাই থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। বড়দের কাজ হবে ছোটদের সহায়ক হওয়া। সে কী শিক্ষক হিসেবে, কী অভিভাবক হিসেবে। কিন্তু ঠিক কতটা সহায়তা দেবেন বড়রা? ছোটদের সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা যেমন ভাল নয়, তেমনি ভাল নয় ছোটদের সব কিছুতে পদে পদে নির্দেশ দিয়ে কাজ করানো।

যেখানে ছোটরা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না সেখানে বড়দের সহায়তা নিশ্চয়ই কাজে আসবে। হয়তো দেখা দিচ্ছে কোন জটিল সমস্যা। সামান্য একটি অংশ না করতে পারায় হয়তো ভেস্তে যাচ্ছে একটা বড় রকম প্রকল্প। সেখানে বড়দের সাহায্য দরকার। কিন্তু প্রধান উদ্যোগটা থাকা ভাল ছোটদেরই হাতে। বরং বলা চলে ছোটদের নেয়া উদ্যোগকে উৎসাহিত করা আর চালু রাখাই সবচাইতে দরকারী। বড়রা যোগাড় করে দিতে পারেন বইপত্র, যন্ত্রপাতি, সাহায্য করতে পারেন কোথাও নিরীক্ষা-সফরের ব্যবস্থা করতে, কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে। আর সব-চাইতে বড় কথা বড়রা যোগাতে পারেন উৎসাহ আর সমর্থন।

বিজ্ঞান সন্ধানী হতে হলে স্কুলে বা কলেজে ক'বছর পড়তে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোন্ ক্লাবের সদস্য হতে হবে বা কত চাঁদা দিতে হবে—তারও কোন নিয়ম নেই। তাহলে বাড়িতে চুপচাপ একা বসে বই পড়ে, পরীক্ষা করে কি বিজ্ঞান সন্ধানী হওয়া যায় না?

হ্যাঁ, তাও নিশ্চয়ই যায়। এমন অনেক বিজ্ঞানী ছিলেন যাঁরা আদৌ স্কুলে পড়েন নি—যেমন লেনসের সাহায্যে অনুবীক্ষণ আবিষ্কারক আন্টন ভ্যান লেভনহুক। আবার নিবিষ্ট মনে গবেষণাগারে কাজ করে বিরাট বড় আবিষ্কার করেছেন এমন বিজ্ঞানীও যথেষ্ট আছেন—যেমন রেডিয়াম আবি-ষ্কারক মারি কুরী।

কিন্তু আজকের যুগ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার যুগ। আজকের মানুষের জীবন নানা জটিল সমস্যায় ভরা। সবাই মিলে-মিশে এসব সমস্যা একজোট হয়ে মোকাবিলা করা দরকার। শুধু বিজ্ঞানের তথ্য জানাই তো বিজ্ঞান সন্ধানীর কাজ নয়, বড় কথা হল অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে আনন্দ পাওয়া, প্রকৃতির নিয়মকানুন আর সমাজের নানা সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করা,

আর সে-সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।

চীন দেশের বিপ্লবের সময়ে সে দেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। সে দেশের খনিজ সম্পদের কথাও জানা ছিল অতি সামান্যই। হাজার হাজার তরুণ কর্মী বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে খনিজ উপাদানের সন্ধানে। তার ফলে সে দেশে নানা দুর্গম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে বিপুল খনিজ সম্পদের খবর। তেমনি ঘটেছিল গত মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে। সারা দেশ তখন মরণপণ লড়াইয়ে ব্যস্ত। সেই যুদ্ধের কাজে যোগ দিয়েছে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা খাঁচা পেতে ধরেছে উত্তর থেকে উড়ে আসা হাজার হাজার যাযাবর পাখি ; তারপর এইসব পাখিদের পায়ে আংটা লাগিয়েছে এসব ছেলেমেয়েরাই। দেশের নানা অংশে ছেলে-মেয়েদের খাঁচায় ধরা পড়েছে এমনি আংটা লাগানো পাখি ; হয়তো একই পাখি ধরা পড়েছে বারবার নানা জায়গায়। তার ফলে সেই যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন-ভরা দিনগুলোতেও যাযাবর পাখিদের চলাচল সম্বন্ধে বহু খবর যোগাড় করেছে সেই তরুণ বিজ্ঞান সন্ধানীরা। দেশজোড়া অসংখ্য কর্মীর সহ-যোগিতা ছাড়া এ ধরনের খবর যোগাড় করা আদৌ সম্ভব হত না।

জানি, সবাই হয়তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না। কেউ হয়তো মুচকি হেসে বলবে ঃ কিন্তু কি লাভ এমনি বুনোহাঁস অথবা মরীচিকার পেছনে ছুটে ?—তার চেয়ে কি ভাল নয় মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে খানিকটা দর্শনের চর্চা করা, কিংবা কল্পনার রথে চেপে কোন রোমাঞ্চ-উপন্যাসের নায়কের সাথে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরোনো।

এর জবাব আমার জানা নেই। তবে বিজ্ঞান সন্ধানীর সবচেয়ে বড় আনন্দ এই সন্ধানেরই মধ্যে, আর তার সবচেয়ে বড় পুরস্কারও এই সন্ধা-নেরই ফলাফল। এই আনন্দ আর এই পুরস্কারের দাম নেহাত কম নয়।

আর তাই বিজ্ঞানের নীরব সাধনায় নেমেছেন যুগে যুগে শত সহস্র বিজ্ঞানী। নানা বিপদ, দুর্ভোগ আর বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাঁদের সংখ্যা। দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের সরব কোলাহল বিজ্ঞানের বিপুল অভিযাত্রা নিয়ে।

আজকের তরুণ বিজ্ঞান সন্ধানী মোটেই নিঃসঙ্গ, একা নয়—সভ্যতার বিশাল স্রোতে এক মহাযাত্রার পথিক, অন্তহীন মিছিলের উজ্জ্বল একটি মুখ।

বুনিয়াদী বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানী সমাজ

০ ০

আমাদের মত উন্নতিশীল দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে বিজ্ঞানের বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনার দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই—এ সত্য আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশে অন্তত তিন-চতুর্থাংশ লোক নিরক্ষর, যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ সাক্ষর তাদেরও অতীত বিদ্যাচর্চার পরিধিতে বিজ্ঞানের স্থান ছিল অতি গৌণ। এই পটভূমিতে বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হবার ব্যাপারটি যে রীতিমত দুঃসাধ্য এই বোধটি মনে হয় সকলের কাছে এখনও খুব স্পষ্ট নয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানকে অবিলম্বে প্রাধান্য দিতে হবে, জাতীয় পর্যায়ে এ রকম একটা জরুরী সিদ্ধান্ত নিলেও আদতে তা কার্যকরী করা অত্যন্ত জটিল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মনে রাখতে হবে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মানের দিক দিয়ে অতি দুর্বল হলেও আকারে নিতান্ত ছোট নয়। চল্লিশ হাজারের ওপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় নব্বই লক্ষ, প্রায় ন হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বাইশ লাখের মত। এছাড়া দু'হাজারের ওপর মাদ্রাসায় আছে আরো প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দু'লাখ, উচ্চতর স্তরে রয়েছে আরো প্রায় দেড় লাখ। দেশে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হলে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্যে যথাযোগ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেবার একটি উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই হবে সব শিক্ষার্থীকে এবং তাদের মাধ্যমে দেশের সব মানুষকে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানমনা করে তোলা। বিজ্ঞান-চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত হতে চাই দৈনন্দিন জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে, কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতির সাথে, আর শিখতে চাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজেদের জীবনের, সমাজের আর দেশের নানা সমস্যার সমাধান করার কলাকৌশল। দেশের সব ছেলেমেয়ের মধ্যে ব্যাপক বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ঘটলে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিকাশেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভবিষ্যতের পেশা হিসেবে বিজ্ঞানকে বেছে নেবে। তাদের আবিষ্কার আর উদ্ভাবন এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের নতুন নতুন ব্যবহারের পথ খুলে

দেবে, দেশের উৎপাদন বাড়বে, সাধারণ মানুষের মেহনত কমবে—এক কথায় দেশের সমৃদ্ধি ঘটবে, মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হবার বীজ বোনা হয় স্কুল পর্যায়েই। স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে আসে তাদের উঠতি বয়স, কৌতূহলে ভরা মন। নতুন নতুন বিষয়ে জানবার, নতুন জিনিস হাতে-কলমে পরখ করে দেখার আগ্রহ তাদের অপরিসীম। অনুসন্ধিৎসা, তথ্য আর বুদ্ধির প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের কৌশল অর্জন শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। এই আগ্রহ আর কৌতূহলের স্ফুরণ ঘটতে পারে ভাল পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই, ভাল শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিজ্ঞান বিষয়ে সহপাঠ নানা বই পড়া বা বিজ্ঞান ক্লাব জাতীয় অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। এমনকি যারা বড় হয়ে পেশাদার বিজ্ঞানী হবে না তাদেরও নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনে আর যোগ্য নাগরিক হবার জন্যে দরকার মোটামুটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রতি মমতা আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগাবার আগ্রহ।

কিন্তু মানুষের আয়ত্ত সমগ্র জ্ঞানের পরিধি আজ হয়ে উঠেছে বিশাল। আর এই জ্ঞানের পরিমাণ ক্রমাগত প্রচণ্ড গতিতে বেড়েই চলেছে। বাড়ছে তথ্যের পরিমাণ, তত্ত্বের পরিসর, কলা-কৌশলের ব্যাপ্তি। বিজ্ঞানের একেবারে মূল কথাগুলো যদি স্কুলের পাঠ্যসূচীতে ঢোকাতে হয় তাহলে তার পরিমাণও হয়ে ওঠে বিপুল। তার ওপর মনে রাখতে হবে আজ যে শিশু বা কিশোর-কিশোরী স্কুলে পড়ছে, সে যখন বড় হয়ে উঠবে ততদিনে বিজ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হবে, সামাজিক পরিবেশও বদলে যাবে এই সময়ে। তাই শুধু আজকের দিনের জন্যে নয়, সেই আগামী দিনের জন্যেও প্রস্তুত করতে হবে তাকে।

অথচ স্কুলের সময়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ ; অন্যান্য নানা বিষয়ের চাহিদাও ভুললে চলবে না। বিজ্ঞানের বিশাল পরিমণ্ডল থেকে বেছে নিতে হবে কি শেখানো হবে, কতটা পরিমাণে, আর কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অসংখ্য বিভাগ, ক্রমবর্ধমান অসংখ্য তত্ত্ব আর তথ্য থেকে মূল বিষয়গুলোকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরার সমস্যাটা মোটেই সহজ নয়। তুলে ধরতে হবে এমনভাবে যাতে বিজ্ঞানের মূল সুরটা, বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের আর সে জ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগাবার মূল পদ্ধতিটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে মাত্র ১৯৬১ সাল থেকে। তার আগে চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান নামমাত্র পাঠ্য বিষয় হিসেবে চালু ছিল। কিন্তু সেকালে স্কুলের জন্যে বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী শিক্ষক ছিল একান্ত দুর্লভ। তার ওপর বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি প্রায় কোন স্কুলে ছিল না বললেই চলে। তার চেয়ে বড় কথা, মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার জন্যে বিজ্ঞান পড়ার প্রয়োজন ছিল না বলে অধিকাংশ স্কুলে নীচের ক্লাসেও আদৌ বিজ্ঞান পড়ান হত না।

১৯৬১ সাল থেকে যে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয় তাতে প্রাথমিক স্তর থেকেই সাধারণ বিজ্ঞানকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে পাঠ্যবই-এর ব্যবস্থা ছিল না, তবে চতুর্থ শ্রেণী থেকে সাধারণ বিজ্ঞানের বই ছিল। এই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একই বছর থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে বিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবহারিক শিল্পকলা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি গ্রুপ চালু হয়। এসব গ্রুপের ছেলেমেয়েদের নবম ও দশম শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় পড়তে হয়। মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের ছেলেমেয়েদের নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়তে হয় সাধারণ বিজ্ঞান।

বলা বাহুল্য, আনুষ্ঠানিকভাবে সাধারণ বিজ্ঞান এবং নৈর্বাচনিক বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করার পরও বিভিন্ন স্কুলে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, বিজ্ঞানের উপকরণ ও শ্রেণীকক্ষ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ছিল সময়সাপেক্ষ। সাধারণ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা চালু হয় বেশ ক'বছর পরে। ক্রমে বিজ্ঞান গ্রুপে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন তা মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়িয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই হার প্রায় অর্ধেক।

এরপর ১৯৭৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা ১৯৭৬ সালে প্রাথমিক স্তরের (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী) এবং ১৯৭৭ সালে মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণী ও নবম-দশম শ্রেণী) পাঠ্যসূচী প্রণয়ন শেষ করেন। ১৯৭৮ সালে প্রথম-তৃতীয় শ্রেণীতে, ১৯৭৯ সালে চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীতে এবং ১৯৮০ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই চালু হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞানকে পৃথক

বিষয় হিসেবে গণ্য না করে তাকে 'পরিবেশ পরিচিতি'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরিবেশ পরিচিতির বিষয়গুলো মূলত শিশুর পরিবেশভিত্তিক, তাদের নানা মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা, পরিবেশের জীব ও জড় পদার্থ, পশু-পাখি, সামাজিক পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলো, তাপ ইত্যাদি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্যে পরিবেশ পরিচিতির কোন পাঠ্যবই নেই। শিক্ষাদানের প্রধান উপকরণ হল শিক্ষক নির্দেশিকা। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্যে পরিবেশ পরিচিতির দু'-খানি করে বই রয়েছেঃ (১) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) এবং (২) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ভূগোল, জীববিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের নানা উপাদান। এছাড়া শিক্ষার্থীরা পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে ব্যবহারিক কাজেও অংশগ্রহণ করবে। এই ব্যবহারিক কাজ তাদের সহায়তা করবে নিজ নিজ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর উৎপাদনে অংশীদার হতে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে তারই ভিত্তিতে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীর 'সাধারণ বিজ্ঞান'-এর সমন্বিত পাঠ্যসূচী তৈরি করা হয়েছে। এই সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো, সুশৃঙ্খল চিন্তাপদ্ধতি ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন এবং এসবের দ্বারা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। এছাড়া শিক্ষাক্রমে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে 'কর্মমুখী শিক্ষা' এবং মাধ্যমিক স্তরে 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব বিষয় চর্চার সহায়ক বিভিন্ন উপাদান যাতে সাধারণ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি নবম ও দশম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীর জন্যে ভূগোল ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য বিষয়গুলিকে সমন্বিত করে 'ভৌত বিজ্ঞান' আর 'জীববিজ্ঞান' নামে দুই ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম পত্রে থাকবে বিজ্ঞানের পরিচিতি, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা। দ্বিতীয় পত্রে থাকবে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জীববিদ্যার প্রয়োগ, জনসংখ্যা শিক্ষা, পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়।

মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার জন্যে প্রতিপত্রে থাকবে একশ' নম্বর। শিক্ষার্থীদের মানসিক উৎকর্ষ এবং উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিধি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার গভীরতাও বাড়ানো দরকার বিবেচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা কলাকৌশল যে অনড় নয়, বরং 'বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল' এই মূলতত্ত্বটি এ পর্যায়ে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে প্রাধান্য পেয়েছে।

শিক্ষাক্রম কমিটি প্রতি পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে পাঠ্যবই ও শিক্ষক নির্দেশিকা রচনা, ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, বাগান ও খেত খামারের কাজ, বিজ্ঞান কর্নার, বিজ্ঞান মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে নানা সুপারিশ করেছেন। এছাড়া তাঁরা বলেছেন, "শ্রেণীকক্ষ ও পরীক্ষাগারের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চার পরিধি বৃদ্ধির সুবিধার্থে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করতে হবে। এ ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং সম্ভব হলে অন্যান্য দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় করতে পারবে। এতে শিক্ষার্থীদের মনে বিজ্ঞানী হওয়ার প্রেরণা জাগবে। এছাড়া এর মাধ্যমে কর্মজীবনে যারা বিজ্ঞানী হবে না তারাও অবসর বিনোদনের সময়কে জ্ঞান চর্চার কাজে ব্যবহার করতে পারবে।"

বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয় তো শুধু বই-এর কতকগুলো তথ্যের সমাহার মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং নিয়মকানুন নিশ্চয়ই জানতে হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে চাই পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা ; পরীক্ষা নির্বাচনের কৌশল ; যন্ত্রপাতি ব্যবহারের, পরীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণের দক্ষতা ; বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী অর্জন ; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তথ্যনির্ভর সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস ; বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আর ভালবাসা। এ সব কিছুই দরকার ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হবার জন্যে। দরকার সাধারণ নাগরিক হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে সুখী, সুন্দর জীবন যাপন করার জন্যেও।

বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্যার অন্ত নেই সে বলাই বাহুল্য। প্রথমত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে আজও উপযুক্ত শিক্ষকের রয়েছে গুরুতর অভাব ; সে অভাব যেমন শিক্ষকের সংখ্যার দিক থেকে তেমনি তাদের গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকেও। এ ছাড়া রয়েছে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণের সমস্যা। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার স্বল্পমূল্য উপকরণ উৎপন্ন হয় অতি সামান্য, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য উপকরণেরও রয়েছে গুরুতর অভাব। বিজ্ঞান শিক্ষাদানে উপকরণের ব্যবহার তাই অতি-মাত্রায় ক্ষীণ। দেশে লভ্য নানা সহজ উপকরণ ব্যবহার করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করার জন্যে যে ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপক আয়োজন করা প্রয়োজন তা আজও নানা কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষা, পরীক্ষা বা অনুসন্ধান নির্ভর না হয়ে এখনও রয়ে গিয়েছে মূলত কেতাবী তত্ত্বনির্ভর। এ অবস্থা প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো দু'টি বিষয় বিবেচ্য। এক ঃ বিজ্ঞান শিক্ষা আসলে সার্মাগ্রক শিক্ষা ব্যবস্থারই একটি অঙ্গ, দেশের সার্মাগ্রক শিক্ষা পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিবেচনা করা যায় না। আমাদের দেশে সার্মাগ্রকভাবে শিক্ষার ব্যয়-বরাদ্দ আন্তর্জাতিক হারের তুলনায় যথেষ্ট কম, কম আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যয়ের তুলনাতেও। বাংলাদেশে প্রতি বছর মোট জাতীয় উৎপাদনের বা জাতীয় আয়ের শতকরা ১·৫ ভাগ বা তার কম শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা হয়, অথচ শ্রীলংকার শিক্ষার জন্যে ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের ৪·৯ শতাংশ, বর্মায় ৩·১ শতাংশ, থাইল্যাণ্ডে ৩ শতাংশ। আবর্তক ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে আমাদের শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ ২০৮ কোটি টাকা ; এই বরাদ্দ দেশের সার্মাগ্রক আব-র্তক ও উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দের মাত্র ৬ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন আদতে উচ্চতর স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষার মানের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বলা চলে একে অন্যের পরিপূরক এবং পরস্পরের ওপর একান্তভাবে নির্ভর-শীল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান গবেষণাগার যদি হয় উপ-করণহীন আর বিজ্ঞানচর্চা হয় কেতাবী বা জীবন-সমস্যাবিচ্ছিন্ন, তাহলে নিম্নতর স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাদান উন্নত স্তরের হওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য।

বুনিয়াদী বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও গবেষকদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের এবং গণিতের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এম আই টি-র ফিজিক্যাল সাইন্স স্টাডি কমিটি উদ্ভাবিত পদার্থবিদ্যা, কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োলজিক্যাল সাইন্স কারিকুলাম স্টাডি প্রকল্পের জীববিদ্যা, বিলেতে নাফিল্ড ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে উদ্ভাবিত বিজ্ঞান পাঠ্যসূচী অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান একাডেমী বা নভোসিবির্স্কে বিজ্ঞান-নগরীতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের দ্বারা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান স্কুল পরিচালনার দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও সীমাবদ্ধ আকারে বিজ্ঞানীদের এভাবে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় জড়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৭৫-৭৭ সালের নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচী প্রণয়ন এর প্রমাণ। তবে এ উদ্যোগ আরো শক্তিশালী এবং ফলপ্রসূ হবার প্রয়োজন রয়েছে।

বিজ্ঞানীদের পক্ষে বুনিয়াদী স্তরের ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম তৈরির সময়ে শিশু ও কিশোরদের বিশেষ চরিত্রের কথা মনে রাখা সব সময় সহজ হয় না। প্রথমত ছোটরা ছোট বলেই তাদের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারটি হেলাফেলার বিষয় নয়। বিজ্ঞানের সব তথ্যের সমাহার তাদের আয়ত্তের অতীত, কাজেই বিশেষ বিশেষ বয়সে তাদের সামর্থ্যের সীমার কথা মনে রাখতে হবে, বিবেচ্য তথ্য ও তত্ত্বের মধ্য থেকে সারবস্তু নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই সারবস্তু এমনভাবে নির্বাচন করা দরকার যাতে আগামী দিনে যখন তারা বড় হবে এবং বিজ্ঞানকে তাদের জীবনে অরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে তখনও তা তাদের জীবনে কাজে লাগে। দ্বিতীয়ত শিশু-কিশোরদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিবেশন করা দরকার তাদের উপযোগী ভঙ্গীতে। এজন্যে মনে রাখতে হবে তাদের মানসিক স্তরের কথা, তাদের গ্রহণ ক্ষমতার কথা। পরিবেশন করতে হবে যথাসম্ভব কাছে থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে দূরের জিনিস, সহজ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়, প্রত্যক্ষ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে অপ্রত্যক্ষ বা বিমূর্ত ধারণা। পরিবেশনের ভাষাও হওয়া চাই শিশু আর কিশোরদের উপযোগী, পদ্ধতি হওয়া দরকার তাদের কৌতূহল ও প্রবণতার অনুকূল।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানকে শুধু কতকগুলো নীরস তথ্য আর তত্ত্বের পুঞ্জ হিসেবে দেখলে হবে না। তত্ত্বের উপলব্ধি নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাথে গড়ে তোলা চাই বাঞ্ছিত মনোভঙ্গী আর অনুরাগ—মুক্ত মন, অনুসন্ধিৎসা, প্রকৃতির নিয়মে আস্থা ; আর চাই প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ—পর্যবেক্ষণের দক্ষতা, চিন্তার কৌশল, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ; বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের ক্ষমতারও চর্চা চাই।

গবেষণাগারে নিবিষ্ট গবেষণায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই তাঁদের গবেষণা কর্ম অব্যাহত রাখবেন। নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটিয়ে মনোজগতের ও ব্যবহারিক জগতের নানা সমস্যার সমাধান ঘটাবেন। কিন্তু তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, এদেশের অগণিত শিশু-কিশোর তরুণরাও আপনাদের দিকে তাকিয়ে, এদের কথাও আপনারা ভাবুন, এবং এদের জন্যে আপনাদের অমূল্য সময়ের খানিকটা দান করুন। আমরা জানি, বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা অংশ ইতিমধ্যে এদিকে যথেষ্ট মূল্যবান অবদান রাখছেন। দেশে তরুণ সমাজের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টায় দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলেছে। এ দেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষার সঙ্গে, বিশেষ করে শিশু-কিশোর তরুণ সমাজের শিক্ষার সঙ্গে, অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসু নবীন বিজ্ঞানকর্মীর বিভিন্ন শৌখিন প্রচেষ্টার সঙ্গে যদি দেশের বিজ্ঞানী সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে দেশে বিজ্ঞানের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে, আগামী দিনের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(মার্চ ১৯৮০)

বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

০ ০

আধুনিক বিজ্ঞানের বিপুল বিস্তার শুরু হয়েছে মোটামুটি ষোড়শ শতকের শুরু থেকে। এ সময়েই বিশ্বজগতের গড়ন সম্বন্ধে আশ্চর্য নতুন তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেন পোলিশ ধর্মযাজক নিকলাস কোপের্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)। এর পর এলেন চুম্বকতত্ত্বের আবিষ্কারক উইলিয়ম গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩), বিজ্ঞানের দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), জ্যোর্তিবিজ্ঞানী জোহান কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), শারীরবিদ উইলিয়ম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭), সৌরমন্ডলের রহস্য সন্ধানী গালিলিও গালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২)। তারপর সপ্তদশ শতকে এলেন সকল কালের সেরা বিজ্ঞানী মহাকর্ষের আবিষ্কারক আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) যিনি বললেন, "আমি যদি আর সবার চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত দেখে থাকি সে শুধু এ জন্যে যে, আমি দাঁড়াতে পেরেছি অনেক মহামানবের কাঁধের ওপরে।"

আজ এই বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গত প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার ফল আমাদের চারপাশে ছড়ানো। বলাই বাহুল্য এই পাঁচ শতকের অগ্রগতিরও পুরনো ইতিহাস আছে ; এরও পেছনে আছে মানুষের বহু হাজার বছরের অন্বেষা আর প্রকৃতি চর্চা। আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীকদের বিজ্ঞান সাধনা, কিংবা হাজার বছর আগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মূল্যবান অবদানের ছাপ আঁকা আছে বিজ্ঞানের এই আঁকাবাঁকা অগ্রযাত্রার পথে।

এই দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানের বিপুল বিকাশ সুষম হয়েছে এমনও বলা যাবে না। বিজ্ঞানের অবদানকে কেন্দ্র করে নানা দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে সম্পদ আর শক্তির বিশাল বৈষম্য। সঞ্চিত পুঁজির সম্পদে বলীয়ান ধনবাদ সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিয়ে থাবা বিস্তার করেছে পররাজ্যের ওপর। বৈষম্য শুধু দেশ আর দেশের মধ্যেই বাড়েনি, বেড়েছে একই দেশের মানুষের মধ্যেও। বিজ্ঞানের জ্ঞান যে বিপুল বাড়তি সম্পদ সৃষ্টি করেছে তার

সিংহভাগ পুঁজির নিগড়ে বাঁধা পড়ে সঞ্চিত হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। আর ঔপনিবেশিক শোষণের ফল হিসেবে যে সব দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ আজ তাদের দলে।

তবু, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, বিগত পাঁচ শতক ধরে ক্রমাগত আধুনিক বিজ্ঞানের যে প্রসার ঘটেছে দুনিয়ার আর পাঁচটা দেশের মানুষের মত আমরাও তার উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী শুধু মানুষজাতির অংশ বলে প্রতীকী অর্থে নয়, বাস্তব অর্থেও। আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দুনিয়ার আর সব দেশের চেয়ে কম হতে পারে, কিংবা দেশের অধিকাংশ মানুষ হতে পারে নিরক্ষর অথবা ক্ষুধার সীমার নীচে। কিন্তু তবু জন্মনিয়ন্ত্রণের অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এদেশের মানুষের কাছেও লভ্য। বিশ্বের অতি দূর প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দৃশ্য কৃত্রিম উপগ্রহ আর হ্রস্ব বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে দৃশ্যমান এদেশের অভুক্ত মানুষের সামনে টেলিভিশনের পর্দায়। বঙ্গোপসাগরে দূরাগত সাইক্লোনের সতর্ক-সংকেত দেবার যে অতি আধুনিক ব্যবস্থা তারও ফল লভ্য আমাদের কাছে। আবার তার পাশাপাশি মহাশূন্যে ভাসমান কোন পরাশক্তির পারমাণবিক অস্ত্র যদি ভেঙে পড়ে শূন্যপথে তাহলে তার তেজস্ক্রিয় ছাই নির্বিচারে মৃত্যু বর্ষণ করবে আমাদের দেশের মানুষের ওপরও।

অর্থাৎ আমরা শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির উত্তরাধিকারী একথা বললে সব বলা হল না ; স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমরা এই অগ্রগতির প্রত্যক্ষ অংশীদার ও ফলভোগী। বিজ্ঞানের বিকাশের একটি ফল হল দুনিয়ার নানা দেশের মানুষের পরস্পরের নৈকট্য। কী যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিতে, কী বার্তাবিস্তারের আধুনিক পদ্ধতিতে দেশে দেশে মানুষের দূরত্ব আজ প্রায় অপসারিত। আধুনিক বিজ্ঞানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তার প্রভাব সমগ্র সমাজের ওপর ব্যাপ্ত ; নিতান্ত অরণ্যচারী মানুষ ছাড়া তার আওতার বাইরে থাকা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই শুধু দুঃসাধ্য নয়, প্রায় অসাধ্য। অসুখ হলে আপনি আধুনিক ওষুধ খাবেন না এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারেন, কিন্তু শহরে বাস করেও কলের পানি খাবেন না এমন সংকল্পে স্থির থাকা শক্ত। আকাশ থেকে মশক নিধনের বা ফসলের কীটনাশক ওষুধ ছড়ানো হলে তা নির্ঘাৎ আপনার ঘরের হাওয়াও কলুষিত করবে। রাসায়নিক কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া কিংবা বিষাক্ত পানি আপনার জীবনকে বিপন্ন করবে বিজ্ঞানের প্রতি আপনার অনুরাগ বা বিরাগের কোন খবর না নিয়েই।

সংক্ষেপে, বিজ্ঞান আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রভাবিত করছে আজকের প্রতিটি মানুষের জীবনকে। কাজেই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির হাতে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করতে না চাইলে আজকের সমাজের কোন মানুষই নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না বিজ্ঞান সম্পর্কে। বরং বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে জীবনকে উন্নত, সমৃদ্ধ করতে চান সকলেই। দৈনন্দিন জীবনে নানা বস্তুর ব্যবহারে সহায়তা করে বিজ্ঞানের জ্ঞান ; লাঘব করে মানুষের শ্রম ; সাহায্য করে অপচয় এড়াতে, উৎপাদন বাড়াতে, রোগ-ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেতে। বিজ্ঞানের জ্ঞান সাহায্য করে নানা আশু বা দূরাগত বিপদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে। এ সব যেমন সত্যি ব্যক্তিগত জীবনের বেলায়, তেমনি সত্যি পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও।

বিজ্ঞানের সাথে আজকের মানুষের জীবনের এমন নিগূঢ় সম্বন্ধ বলেই দুনিয়ার সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের পাঠ নিচ্ছে ছেলেমেয়েদের একটি ছোট ভগ্নাংশ। যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করার উপায় কি? যারা বিদ্যালয়ে গিয়েছে কোন এক সময়ে অথচ এখন যাদের আর বিদ্যালয়ে যাবার কথা নয়, তাদের কাছে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান কি করে পৌঁছবে?

আসলে সাধারণ মানুষ যেমন তার জীবনের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের কথা জানতে চায়, তেমনি বিজ্ঞানের সম্বন্ধে অনেকের ভয়ও আছে। সাধারণতঃ ধরে নেয়া হয় সাহিত্যের চেয়ে বিজ্ঞান কঠিন। বিজ্ঞান শিখতে গেলে জটিল গণিত আয়ত্ত করতে হয়। মেয়েরা বিজ্ঞান ভাল বুঝতে পারে না, এমন একটি ধারণাও অনেকের মধ্যে রয়েছে।

অর্থাৎ আমাদের প্রচলিত সংস্কৃতিতে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, খেলাধুলার আসন যেমন সহজ স্বাভাবিক, বিজ্ঞানের বেলায় ঠিক তেমন নয়। বিজ্ঞান যেন বিদেশী, বিজাতীয়, অনাহূত অতিথি হয়ে আমাদের জীবনে এসেছে ; হয়ত হঠাৎ কখনো তাকে বিদায় করে দিতে হবে। গণিত এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের দুই সহযাত্রী। গণিত ছাড়া বিজ্ঞানের ভাষা আড়ষ্ট ; আর প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের কৌশল। তবু গণিতের প্রতি বিতৃষ্ণা তার চর্চায় এবং পদ্ধতিতে আমরা অভ্যস্ত নই বলে। প্রযুক্তির প্রতি

বিতৃষ্ণা কিছুটা গণিতের ব্যবহারের জন্যে, কিছুটা হাতে ময়লা লাগানো কায়িক শ্রমের প্রতি বিরাগের ফলে।

অথচ আজকের দিনে সামাজিক রূপান্তর সম্ভব নয় বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ছাড়া, গণিত আর প্রযুক্তির জন্যে দেশজোড়া অনুরাগ সৃষ্টি না হলে। ব্যাপক প্রয়োগ বলতে আমি শুধু শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রয়োগ বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি সারা দেশের সব মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আর দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করাকে। আবার দেশব্যাপী এমনি বিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব নয় শুধু বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এ জন্যে দরকার দেশজোড়া বিজ্ঞান আন্দোলনের।

এই বিজ্ঞান আন্দোলন যে শুধু দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে দরকার তা নয়, দরকার বিজ্ঞানীদেরও স্বার্থে। বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধে, পর্যাপ্ত সম্পদ আর উপকরণ। কিন্তু এসব সুযোগ-সুবিধে পাওয়া সম্ভব হবে না দেশে বিজ্ঞানের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি না হলে, সাধারণ মানুষের সমর্থন না পেলে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের নিজেদেরই স্বার্থে নামতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজে, দেশকে বিজ্ঞানমনা করে তোলার জন্যে।

বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে হলে যে সব উপায়ে তা করা যেতে পারে, তার মধ্যে পড়ে

(ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম

(খ) পত্র-পত্রিকা, বই, পাঠাগার, রেডিও-টেলিভিশন

(গ) বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান সমিতি ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ঐতিহ্য নানা কারণে আমাদের দেশে মোটেই সুদৃঢ় নয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে মাত্র ষাটের দশকের শুরুতে। আর যেহেতু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অতিমাত্রায় পরীক্ষা-নির্ভর, কাজেই যে বিষয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নয় তা নীচের অন্যান্য শ্রেণীতেও পড়াবার গরজ ছিল অতি সামান্যই। এর সাথে যোগ করতে হবে আমাদের চিরাচরিত পুথিগত পাঠদান পদ্ধতি। বিদ্যা অর্জন মানেই হল অতীতের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রদত্ত জ্ঞান আয়ত্ত করা, তাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যা—এ ধারণা বিজ্ঞানের শিক্ষার ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। সব রকম প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা, হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা—এই হল বিজ্ঞান। এর জন্যে যেতে হয় প্রকৃতির কাছাকাছি ; যেমন বই পড়া, তেমনি প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতিকে নেড়ে-

চেড়ে বদলানো। তার জন্যে দরকার যন্ত্রপাতি, উপকরণ নিয়ে কাজ করা, হাতের কাজের দক্ষতা। জ্ঞানের জগৎ আর কাজের জগৎ—এ দুয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন। আর এ কারণেই বিজ্ঞান শিক্ষা এ দেশে এখনও শৈশবাবস্থা পেরোয়নি।

পত্র-পত্রিকা শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের একটা প্রধান মাধ্যম। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের কথা বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইতে বা অন্য বইতে উঠতেও সাধারণতঃ বেশ ক' বছর পেরিয়ে যায়। কাজেই সাথে সাথে দেশের মানুষের কাছে নতুন নতুন আবিষ্কারের খবর পৌঁছয় সচরাচর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। এখানে বড় সমস্যা আমাদের দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল ঃ পত্রপত্রিকার প্রচার সংখ্যার সীমাবদ্ধতা। যে সীমাবদ্ধতা পত্রপত্রিকার, সেই একই সীমাবদ্ধতা বই-এর জগতে। সারা দেশে পাঠাগারের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। কোন বই যদি দু'হাজারের ওপর ছাপা হয় আর তা পাঁচ বছরের কম সময়ে বিক্রী হয়ে যায় তাহলে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে ওঠে।

এই অক্ষরজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যায় রেডিও ও টেলিভিশনে। ট্রানজিস্টরের কল্যাণে রেডিও আজ গ্রামাঞ্চলেও ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে। টেলিভিশনও পৌঁছচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। এ সব গণমাধ্যম কৃষির নানা আধুনিক পদ্ধতি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ে নানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে তরুণ সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রীতি এবং বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ, বিশেষ করে এ কারণে যে, বিজ্ঞান যে মানুষের সংস্কৃতির একটা অপরিহার্য অঙ্গ এই প্রবণতার মাধ্যমে মনে হয় আমরা অবশেষে তার স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করেছি। এসব বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে শুধু তরুণদের মধ্যেই বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ ঘটছে তা নয়, বিজ্ঞানী, তরুণ সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যেও একটা অতি বাঞ্ছিত যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান সমিতিগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এগুলো উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে, যাদের কৌতূহল অত্যন্ত প্রখর, নানা বিষয়ে যাদের জানবার আগ্রহ অত্যন্ত তীব্র, তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, উপলব্ধি ও দক্ষতা সঞ্চারে সাহায্য করছে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের পোশাকী পরিবেশের বাইরে কর্তৃত্বের কড়া শাসনের আওতামুক্ত একটা স্বাধীন জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধানের পরিমন্ডল লালিত হচ্ছে এসব অনা-

নুষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। ক' বছর থেকে দেশব্যাপী যে বিজ্ঞান সপ্তাহ ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে বহু লক্ষ বিজ্ঞানমনা ছেলেমেয়ে অংশ গ্রহণ করছে ; এদের মধ্যে প্রজেক্ট নির্মাণে, অন্বেষার কৌশলে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে।

এ সব ক্লাব, সমিতি, সংগঠন প্রভৃতির কার্যক্রমকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে, বিজ্ঞানের সুগঠিত চর্চার পথকে প্রশস্ত করতে হলে চাই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অসংখ্য বই। বলাই বাহুল্য, এ দিকেও আমাদের প্রায় শৈশবকাল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা বিস্তারের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদানন্দ রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে পথের সাহসী পথিকৃৎ, আমাদের দেশে ডঃ কুদরাত-এ-খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, শাহ্ ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, ডঃ জহুরুল হক প্রভৃতি তাঁদেরই সার্থক উত্তরসুরী ও পুরোধা। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তরুণতরদের মধ্যে ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম, ডঃ আলী আসগর, ডঃ শমশের আলী প্রমুখ বিভিন্ন ভঙ্গিতে যথেষ্ট উদ্যোগশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বা বিজ্ঞানের জনপ্রিয়-করণের এ ধারা আমাদের দেশে আজো রীতিমত ক্ষীণ। মনে হয় বিজ্ঞানীরা এখনও এই কাজটিকে তাঁদের একটি প্রধান দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেননি। দেখেছেন বড় জোর কখনো সাময়িক দায়সারা গোছের বা বিচ্ছিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টা হিসেবে।

আসলে বিজ্ঞানীদের এটা বোঝার সময় এসেছে যে এ দায়িত্বটি পরহিতে নিয়োজিত তাঁদের আকস্মিক করুণার দান নয়, বরং তাঁদের নিজেদেরই একান্ত স্বার্থে প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণের মধ্যে যদি বিজ্ঞানের উপলব্ধি ও বিজ্ঞানের প্রতি সমর্থন ব্যাপক না হয় তাহলে আদৌ সম্ভব নয় বিজ্ঞানের বিকাশ বা বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা। একথা বুঝেছিলেন সকল কালের সেরা বিজ্ঞানীরা। এজন্যেই সব দেশের সেরা বিজ্ঞান সাধকরা চিরকালই জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। কখনও এজন্যে মুখোমুখী হয়েছেন প্রবল বাদ প্রতি-বাদের। এমনি ঘটেছে গালিলিও, নিউটন, ডারউইন, আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্ত্য জগতে একালে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে যাঁরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই বিজ্ঞানের নিষ্ঠাবান সাধক।

বলা বাহুল্য মূলতঃ বিজ্ঞানী নন এমন অসংখ্য ব্যক্তিও বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা সাধনের জন্যে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে পড়েন

সাংবাদিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক। সাম্প্রতিক কালে বাংলাভাষায় যাঁরা লিখে-ছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা চলে সমরেন্দ্রনাথ সেন, অমল দাশ-গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন সেন, সমরজিৎ কর প্রভৃতির। আরো অসংখ্য সাংবাদিক নানা সাময়িকীর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানের নানা বিস্ময়কর আবিষ্কারকে সহজবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

সংবাদপত্রে সাময়িকীতে যা কিছু বেরোচ্ছে তার সবই যে বিজ্ঞানানুগ হচ্ছে তা অবশ্যই নয়। বহু তথ্য বেরোচ্ছে বিকৃতভাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে চমকপ্রদ অথচ অবৈজ্ঞানিক বহু সংবাদ বিজ্ঞানের খোলস পরিয়ে ছাপানো হচ্ছে; প্রাকৃতিক ঘটনার দেয়া হচ্ছে নানা অপব্যাখ্যা। এবং সাধারণভাবে আমাদের দেশে সংবাদপত্রে যে প্রচুর স্থান দেয়া হয় চুরি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি খবরের জন্যে, বিয়ে, কুলখানি ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য ছাপাতে, সে অনুপাতে বিজ্ঞানের খবর, বলাই বাহুল্য, যথেষ্ট জায়গা পায় না।

বিজ্ঞানের রচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন পরিভাষা ও রচনাশৈলী একটা বড় সমস্যা। পরিভাষার বিষয়টি আসলে সমস্যা সৃষ্টি করে প্রধানত উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চতর বিজ্ঞানের পাঠ্যবই রচনায়। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা যা সাধারণ পাঠকদের জন্যে লেখা হবে তার ভাষা হওয়া চাই সহজ, আটপৌরে—সেখানে কঠিন, পরিভাষা কণ্টকিত ভাষা বেমানান ঠেকবে। এর অর্থ এ নয় যে, সাধারণ পাঠকদের জন্যে রচনায় শব্দ প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই, তথ্য বা ব্যাখ্যা নিখুঁত না হলেও চলবে। তথ্যনিষ্ঠা বা রচনাশৈলী মূলত নির্ভর করে রচনাটি কি উদ্দেশ্যে এবং কার জন্যে লেখা তার ওপর। কেন লিখছি আর কার জন্যে লিখছি এটা স্পষ্ট করে নিলে তার ভিত্তিতেই স্থির করতে হবে রচনার ভঙ্গির আর তথ্যের শুদ্ধতার মানদণ্ড।

লেখাটি যদি হয় বিজ্ঞানীদের বিবেচনার জন্যে তাহলে তা অবশ্যই লেখা হবে সেই বিষয়ের পারিভাষিক শব্দে। শব্দ তো আসলে কতগুলো ধারণার প্রতীক। সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমাদের যে সব ধারণা নিয়ে কারবার, বিজ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্বের বর্ণনায় স্বভাবতই ধারণার জটিলতা তার চেয়ে বেশি; তাই সেখানে শব্দের নির্দিষ্টতার প্রয়োজনও দেখা দেয় বেশি। অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা দুই বিজ্ঞানীর কাছে হবে হুবহু একই অর্থের দ্যোতক। এই সুনির্দিষ্টতা যেমন প্রয়োজন ধারণায় ও

শব্দে, তেমনি অন্যান্য প্রতীকে, সংখ্যায়। আবার সেই একই বিষয় যদি লেখা হয় সাধারণ পাঠকের জন্যে তাহলে ধারণা বা প্রতীক বা সংখ্যার সেই অতিমাত্রায় সুনির্দিষ্টতা আর অবশ্য-প্রয়োজন নয়। কেননা এখানে উচ্চ মার্গের শুদ্ধতার চেয়ে বড় প্রয়োজন পাঠকের পূর্বজ্ঞান, প্রয়োজন আর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ভাষায় বিষয়টি তার কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ একে তুলনা করেছেন নৌকোর ভার কমিয়ে তার বেগ বাড়ানোর সাথে।

এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বড়দের আর ছোটদের লেখার মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষপাতী। তাঁরা মনে করেন ছোটদের জন্যে লেখার শব্দ চয়ন আর বর্ণনাশৈলী বড়দের জন্যে লেখার চেয়ে ভিন্ন হবে। আমার কিন্তু মনে হয় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনায় বড়দের আর ছোটদের মধ্যে এই প্রভেদ অনেকটা কৃত্রিম। বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে বিজ্ঞানের জ্ঞানের দিক থেকে বড়রা অধিকাংশ আসলে কিশোরেরই সমতুল্য।

ছোটদের জন্যে বই-এর ভাষা যদি হয় সহজ, চিত্রধর্মী, চিত্তাকর্ষক তাহলে তা বড়দের জন্যে কিছু কম আকর্ষণীয় হবার কোন কারণ নেই। সে বই যদি হয় চিত্রশোভিত, বিশেষ করে রঙিন ছবিতে, তাহলে তা ছোট-বড় সবার কাছেই সমান আকর্ষণীয় হবার কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ছোটদের জন্যে লেখা বিজ্ঞানের বই বাপ-মায়েরাও সমান আগ্রহ নিয়ে পড়েন এবং হয়ত সমানভাবে উপভোগ করেন (যদিও ছোটদের চেয়ে বেশি বোঝেন কিনা বলা শক্ত)।

একথা বলার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের বই শুধু ছোটদের জন্যেই লিখতে হবে। ছোটরা সবাই উপলব্ধির দিক থেকে এক পর্যায়ের নয়, যেমন এক পর্যায়ের নয় বড়রাও সবাই। কাজেই বই দরকার নানা পর্যায়ের পাঠকদের জন্যে। নানা পর্যায়ের ভাষায়, নানা পর্যায়ের উপলব্ধির স্তরে, নানা ধরনের বিষয়ের ওপরে। যেমন দরকার বিজ্ঞানের নানা রহস্যের ব্যাখ্যা, তেমনি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে, দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের ওপরে, হাতে কলমে কাজের সম্বন্ধে।

সব মিলিয়ে দরকার বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার একটি দেশজোড়া আন্দোলন। যুগে যুগে মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার, সত্য-সন্ধানের একান্ত সাধনার ফসল যে বিজ্ঞান, যার উত্তরাধিকারী সারা দুনিয়ার মানুষ, তার ফলকে পৌঁছে দিতে হবে দেশের সব মানুষের ঘরে ঘরে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন দেশের বিজ্ঞানী সমাজ—যাঁরা বিজ্ঞানের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ

আবার একই সঙ্গে উদ্বেলিত দেশের মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টায়। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এলেও এতে অংশগ্রহণ করবেন শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, পশুবিদ. প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী—দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব কর্মী মানুষ।

এই আন্দোলন শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞানকে পেঁছে দেবে না মানুষের কাছে, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে দেশকে আরো ভাল করে জানতে, বুঝতে, দেশের সম্পদকে সুচারুভাবে কাজে লাগাতে ; বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে তাদের মেহনতের বোঝা কমাতে, জীবনকে আরো সুখী, আরো আনন্দময় করে তুলতে। শুধু বিজ্ঞানকে জানা আর তাকে কাজে লাগানো নয়, এই আন্দোলন দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে প্রশ্ন তুলতে, অনুসন্ধান করতে, পরীক্ষা করতে ; আর এ সবের মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে। কেননা জনপ্রিয় বিজ্ঞান শুধু তো জনপ্রিয় নয়, তা বিজ্ঞানও। আর এই বিজ্ঞানকে যেমন নিয়ে যেতে হবে জনগণের কাছে, তেমনি জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভব ঘটবে নতুন বিজ্ঞানেরও। এমন এক বিজ্ঞান যা এদেশের মানুষের কাছে বোধ্য, আর তাদের জীবন সংগ্রামের সহযাত্রী।

এমনি বিজ্ঞানের বিকাশের মধ্য দিয়েই ঘটবে এদেশের মানুষের সার্বিক সমৃদ্ধি ; এবং বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের সার্থকতা।

ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী বাংলাদেশে বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব ভুবন নির্মাণ করে নিয়েছেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ও সরস করে পরিবেশনের যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ডঃ মুতীর লাবণ্যময় রচনাগুচ্ছে আমরা তার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করি। এদিক থেকে এদেশে বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার একটি আকাঙ্ক্ষিত রূপ নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর। তিনি যে শুধু পথিকৃতের ঐতিহাসিক দায়িত্বটুকু পালন করেছেন তা নয়; বরং বলা যায় সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সাহিত্যকে একটি শক্তিশালী এবং পরিচ্ছন্ন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারেও তিনি পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সংস্কৃতিবান ও সমাজ সচেতন মানুষটি জটিল, নীরস ও শুষ্ক বিষয়কেও তাঁর অসাধারণ ভাষা ও বর্ণনার ভঙ্গিতে এমন মনোজ্ঞ করে তুলেছেন যে, তাঁর রচনা সকল বয়সের পাঠককে সমানভাবে আকৃষ্ট করে।

ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতীর জন্ম ১৯৩০ সালে। শিক্ষা জীবন শুরু রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসায়। তারপর কলকাতা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ ও ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম. এস-সি. (প্রথম শ্রেণী) ডিগ্রি অর্জন করে রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যাপনা শুরু ১৯৫৪ সালে। এরপর শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনে তিনি সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব ছিলেন। ১৯৮৬ সালের শেষে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে তিনি 'বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প'-এর প্রধান উপদেষ্টা।